মূর্তিপূজার গোড়ার কথা

আবুল হোসেন ভট্টাচার্য

মূর্তিপূজার গোড়ার কথা

আবুল হোসেন ভট্টাচার্য
(প্রাক্তন পুরোহিত সুদর্শন ভট্টাচার্য)

জ্ঞান বিতরণী

www.pathagar.com

www.pathagar.com

©
লেখক

জ্ঞান বিতরণী প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা-২০১০

প্রচ্ছদ
সুব্রত সাহা

প্রকাশক
মোহাম্মদ সহিদুল ইসলাম

জ্ঞান বিতরণী
৩৮/২-ক বাংলাবাজার মান্নান মার্কেট (৩য় তলা)
ঢাকা-১১০০, ফোন ঃ ৭১৭৩৯৬৯

অক্ষরবিন্যাস
জন্মভূমি কালার স্পট

মুদ্রণ
ধলেশ্বরী প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন
৩৮ আর. এম. দাস রোড, ঢাকা-১১০০

পরিবেশক
আহসান পাবলিকেশন
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা
৯১, মগবাজার ওয়ারলেস রেল গেট, ঢাকা।

যুক্তরাজ্য পরিবেশক
সঙ্গীতা লিমিটেড, ২২ ব্রিকলেন, লন্ডন, যুক্তরাজ্য

মূল্য
১৫০ টাকা U.S.$-3

MURTIPUJAR GORAR KATHA (Idolatry & it's origin)
Written By **Abul Hossain Bhattacharja**
Edited by **Ismail Hossain Dinaji**
Published By Mohammad Shahidul Islam
Gyan Bitaroni, 38/-2ka Banglabazar
Dhaka-1100, Tel : 7173969

ISBN : 984-8747-81-8

www.pathagar.com

প্রসঙ্গ কথা

পৃথিবীতে অনেকে জন্মগ্রহণ করেন যারা নিজের কথা খুব কমই ভাবেন। অন্যের কল্যাণ সাধনই তাঁদের চিন্তা-চেতনার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে প্রতিভাত হয়। মানুষের কল্যাণ সাধন এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনই তাঁদের সাধনার ধন। অন্যের জন্য কষ্ট করেই যেন তাঁরা তৃপ্তি অনুভব করেন।

মরহুম আবুল হোসেন ভট্টাচার্য এমনই একজন মহৎ ব্যক্তি ছিলেন যিনি সবসময় অন্যের সুখসমৃদ্ধির কথা চিন্তা করতেন। বিশেষ করে অন্যায় ও ভ্রান্ত পথে পরিচালিত মানুষকে সত্য ও ন্যায়ের পথ দেখিয়ে দেবার জন্য তিনি ছিলেন সর্বদা সচেষ্ট। একই উদ্দেশ্যে তিনি সমাজ-সেবামূলক কার্যক্রমের সঙ্গে সঙ্গে লেখনীও ধারণ করেছিলেন।

বিংশ শতাব্দীর শেষভাগেও যখন মানবসমাজের একটি বৃহৎ অংশ মূর্তিপূজাকে তাদের একমাত্র মুক্তির উপায় মনে করতেন তখন মরহুম আবুল হোসেন ভট্টাচার্য মূর্তিপূজকদের সত্যিকার কল্যাণের পথ দেখাবার জন্য ব্যাকুল। মূর্তিপূজা মানুষের প্রকৃত কল্যাণ করতে পারে না বরং অন্ধ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন করে ফেলে। অকর্মন্য ও নির্বোধ করে তোলে। এ প্রসঙ্গে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি কবিতাংশ উদ্ধৃত করা যায় ঃ

রথযাত্রা সমারোহ মহাধুমধাম
ভক্তেরা লুটায়ে শির করিছে প্রণাম।
রথভাবে আমি দেব পথ ভাবে আমি
মূর্তি ভাবে আমি দেব হাসে অন্তর্যামী।

মরহুম ভট্টাচার্যের রচনাবলীর মধ্যে— *"মূর্তিপূজার গোড়ার কথা"* একটি উল্লেখযোগ্য ও সুপাঠ্য বই। এতে লেখক অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত আলোচনা করে দেখিয়েছেন মানুষকে কোন পথে চলতে হবে। মূর্তিপূজক ও এর অনুসারীদের দ্বারা সমাজের কি মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে তাও খুবই সুন্দর ও সাবলীল ভাষায় আলোচনা করেছেন। লেখক তাঁর যুক্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য বহু প্রামাণ্য গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন। গ্রন্থকার নিজে ব্রাহ্মণ ছিলেন। মূর্তিপূজার সঙ্গে

www.pathagar.com

তার এককালে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল। এমনকি বহু পূজানুষ্ঠানে তিনি পৌরহিত্বও করেছেন। কাজেই মূর্তিপূজার অসারতা ও অমঙ্গল সম্পর্কে তিনি যেসব মন্তব্য করেছেন এ ব্যাপারে দ্বিরুক্তি করা কারোপক্ষে শোভন ও সমীচিন হবে বলে আমরা মনে করি না।

যখন কোনও অন্ধকে দেখা যায় যে, পথ চলতে গিয়ে সে বিপদজনক গর্তের মধ্যে পড়ছে। আর একটু অগ্রসর হলেই সে মারাত্মক বিপদে পড়বে। এ মুহূর্তে তাকে রক্ষার জন্য যদি কাছাকাছি থাকা দৃষ্টিসম্পন্ন লোকেরা কেউ সচেষ্ট না হয়, তাহলে বেচারা নির্ঘাত গর্তে পড়ে মারা যাবে। আর এ জন্য অপরাধী হবে কাছাকাছি থাকা দৃষ্টিসম্পন্ন লোকেরাই। দৃষ্টিসম্পন্নদের মধ্যে যিনি অন্ধকে বিপদ থেকে রক্ষা করে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করবে তিনিইতো প্রকৃত মানুষ। আর যারা অন্ধের এ করুণ অবস্থা দেখে স্থবির হয়ে থাকে বা সুখ অনুভব করে তারা মানবসমাজের কলংক ছাড়া আর কী?

আবুল হোসেন ভট্টাচার্য এমন এক ব্যক্তিত্ব যিনি কারো বিপদ দেখে মুষড়ে না পড়ে এগিয়ে যেতেন তাকে রক্ষা করার জন্য। বিশেষ করে তাঁর ছেড়ে আসা পূর্বধর্মের অনুসারী ও আত্মীয়-স্বজনেরা অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকবে যুগের পর যুগ এটা তিনি মনেপ্রাণে চাইতেন না। তাদের আলোর পথ দেখাবার জন্য লেখকের হৃদয়মন সর্বদা আকুলি বিকুলি করতো। এমনতরো মহৎ উদ্দেশ্য ও কল্যাণব্রতকে সামনে রেখেই তিনি 'মূর্তিপূজার গোড়ার কথা' শীর্ষক মূল্যবান গ্রন্থখানা রচনা করেছিলেন।

লেখকের মহৎ ইচ্ছা পূরণ হোক। অন্ধকারে নিমজ্জিত লোকেরা মুক্ত আলোর পথ খুঁজে পাক। সত্য ও ন্যায়ের পথ সকলের জন্য সুগম হোক।

ইসমাইল হোসেন দিনাজী

বি. এ. অনার্স, এম. এ. (ঢাকা)

২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৭

ঢাকা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

লেখকের কথা

আমি লেখক, সাহিত্যিক, কবি প্রভৃতির কোনওটাই নয়। পুস্তক লিখে প্রশংসা অর্জন, সম্মান লাভ, অর্থপ্রাপ্তি প্রভৃতির সামান্যতম ইচ্ছা এবং আগ্রহ আমার নেই, কেন নেই উপসংহারে সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

আমি অতি নগণ্য জ্ঞানবুদ্ধি এবং দীর্ঘ জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা দিয়ে যে সত্যের সন্ধান আমি পেয়েছি তাকে সত্য করে তুলে ধরাই আমার একমাত্র লক্ষ্য।

অতএব আমার দুর্বল ও অযোগ্য হাতে কোনওরূপে আমার কথাগুলোকে পরিবেশনের চেষ্টা আমি করেছি। কতটুকু সফল হয়েছি অথবা মোটেই হয়েছি কিনা তা সুধী পাঠকবর্গেরই বিচার্য।

বলা আবশ্যক যে, নিষ্ঠাবান যাজক ব্রাহ্মণের সন্তান হিসেবে বেশ কিছুদিন নিজের হাতে আমাকে মূর্তিপূজা করতে হয়েছে। কাজেই মূর্তিপূজা সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা বাস্তব এবং প্রত্যক্ষ। আমার এ বাস্তব এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে আমি নির্ভরযোগ্য তথ্য-প্রমাণাদিসহকারে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

ইসলাম গ্রহণের পর ইসলাম এবং বর্তমান মুসলমানদের সম্পর্কেও প্রত্যক্ষ বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ আমার হয়েছে। আমার এ অভিজ্ঞতার পরিমাণ নগণ্য হলেও তা থেকেই ভীষণ ধরনের একটা আতঙ্ক আমার মনকে বিশেষভাবে চঞ্চল ও বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে।

সে কারণেই এ পুস্তকের উপসংহার মূর্তিপূজকদের সাথে সাথে একান্ত অসামঞ্জস্য অপ্রত্যাশিত এবং অপ্রীতিকর হলেও মুসলমানদের উদ্দেশ্যও বেশ কিছুটা কঠোর ও কর্কশ ভাষায় একটি সতর্কতাসূচক আবেদন আমাকে বলতে হয়েছে।

হে মহান বিশ্বপ্রভু! আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে তুমি কবুল কর! ইসলামের ধারক এবং বাহকদের নিষ্ঠা, সততা ও সার্থকতার সাথে তোমার অর্পিত মহান দায়িত্বসমূহ পালন করার সৌভাগ্য ও তৌফিক দান কর! হে মহান প্রভু! বিশ্ববাসীকে একমাত্র তোমারই দাসত্ব করার সুযোগ, সৌভাগ্য এবং মানসিকতা দান কর। আ-মীন।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচিপত্র

উপক্রমণিকা	ঃ	১১
মূর্তি শব্দের তাৎপর্য	ঃ	১৭
প্রতিমা শব্দের তাৎপর্য	ঃ	১৮
পুতুল শব্দের তাৎপর্য	ঃ	২৩
পুতুল ও প্রকৃতি	ঃ	২৪
অদ্ভুত সাদৃশ্য	ঃ	২৬
দেবদেবী ও দেবতা শব্দের তাৎপর্য	ঃ	২৮
বেদের দেবতা	ঃ	২৮
পৃথিবী স্থানের দেবতা	ঃ	৩১
অন্তরিক্ষের স্থানে দেবতা	ঃ	৩৩
দ্যুস্থানের দেবতা	ঃ	৩৫
উপনিষদের দেবতা	ঃ	৪২
দেবদেবীদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	ঃ	৪৯
দেবদেবীদের শ্রেণীবিভাগ	ঃ	৬১
একটি পর্যালোচনা	ঃ	৬৩
মূর্তির উদ্ভাবন ও পূজা প্রচলন	ঃ	৭৩
অভিমত	ঃ	৭৪
অন্যান্য দেশের দেবদেবী	ঃ	৮৫
উপজাতীয়দের মূর্তিপূজা	ঃ	৯০
মূর্তিপূজার প্রাচীনত্ব	ঃ	৯৬
পরিবেশের প্রভাব	ঃ	১১১
উপসংহার	ঃ	১২১

www.pathagar.com

www.pathagar.com

উপক্রমণিকা

মূর্তি, প্রতিমা, পুতুল তিনটি নাম, তিনটি ইতিহাস। এদের স্রষ্টা মানুষ; সৃষ্টির উপাদান খড়, কূটা, কাদা-মাটি, কাঠ, পাথর বা কোনও ধাতব পদার্থ। যেমন : স্বর্ণ, রৌপ্য, তামা, পিতল প্রভৃতি।

ওদের উদ্ভাবক, রূপকার, সংগঠক, সংস্থাপক প্রভৃতিও মানুষই। ওদের গড়া-ভাঙ্গা, থাকা, না-থাকা, চলা, না-চলা প্রভৃতিও একান্তরূপেই নির্ভর করে মানুষের ইচ্ছা, অনিচ্ছা, অনুরাগ, বীতরাগ এবং আবেগ ও অনুভূতির ওপর।

মূর্তি, প্রতিমা এবং পুতুলকে কেন্দ্র করে যে ইতিহাস গড়ে উঠেছে সেই ইতিহাসের স্রষ্টাও মানুষই। কেননা— ইতিহাস সৃষ্টি করতে হয়; অথচ মূর্তি, প্রতিমা এবং পুতুলেরা কোনও কিছু সৃষ্টি করতে পারে না; সে যোগ্যতা এবং অধিকার ওদের নেই। সুতরাং ইতিহাস সৃষ্টির যোগ্যতা এবং অধিকারও ওদের নেই, থাকতে পারে না। এককথায়— ওরা প্রাণ, প্রজ্ঞা, আবেগ এবং অনুভূতিহীন জড়পিণ্ড।

তবে প্রাণ, প্রজ্ঞা এবং আবেগ ও অনুভূতিহীন জড়পিণ্ড হলেও ওরা খুবই ভাগ্যবান। বিষয়টি খুলে বললে বলতে হয় :

শিল্প মানুষেরা খড়-কূটা, কাদা-মাটি ছেনে অথবা পাথর কেটে কেটে কিংবা ধাতব পদার্থ গলিয়ে ওদের সৃষ্টি করে।

বলাবাহুল্য, এ সৃষ্টির আড়ালে থাকে শিল্পী মানুষের একনিষ্ঠ সাধনা, অক্লান্ত পরিশ্রম, ঐকান্তিক আগ্রহ আর প্রাণের অফুরন্ত সুষমাধারা। যাদের সৃষ্টির আড়ালে এত সাধনা, এত শ্রম এবং প্রাণের অফুরন্ত সুষমাধারা বিরাজমান তারা যে ভাগ্যবান সে সম্পর্কে দ্বিমতের কোনও অবকাশই থাকতে পারে না, অতএব ওরা ভাগ্যবান।

শিল্পী মানুষের স্নেহের আবেষ্টনী থেকে মুক্ত হতে না হতেই ওরা ধার্মিক, সংস্কৃতিবান, সুরুচি-পরায়ণ, ধনাঢ্য, সৌখিন প্রভৃতি নানা শ্রেণী জ্ঞানী-গুণী মানুষ এবং অবোধ ও নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক শিশুদের কামনার বস্তুতে পরিণত হয়ে যায়।

ধার্মিক ব্যক্তিদের একটি বিশেষ শ্রেণী তাঁদের ইচ্ছা ও প্রয়োজনীয়ানুযায়ী ওদের কিছু সংখ্যককে বেছে নিয়ে কোনওটিকে "ভাগ্যবিধাতা" কোনওটিকে

www.pathagar.com

"বাঞ্ছাপূর্ণকারী", কোনওটিকে "সুখ-দুঃখের কর্তা" আর কোনওটিকে অন্য কিছু বলে আখ্যায়িত করে পরম শ্রদ্ধা-ভক্তির সাথে উপাস্যের মহা সম্মানিত আসনে প্রতিষ্ঠা করেন এবং ফুল, চন্দন, ভোগ-নৈবেদ্যাদির নিবেদন ও পূজা-উপাসনার মাধ্যমে ওদের কৃপা-দৃষ্টি আকর্ষণের সাধনায় রত হন।

সংস্কৃতিবান, রুচিশীল, সৌখিন ও ধনাঢ্য ব্যক্তিরা সভ্যতা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য প্রভৃতির বাহন অথবা সম্মান লাভ বা সম্মান বৃদ্ধির উপকরণ হিসেবে নিজ নিজ ইচ্ছা ও প্রয়োজনানুযায়ী ওদের কিছু সংখ্যককে বেছে নিয়ে ড্রইং রুমের সুদৃশ্য ও মূল্যবান কাঁচাধার অথবা অন্য কোনও প্রদর্শনীয় স্থানে অতীব যত্ন ও নিপুণতার সাথে সাজিয়ে রাখেন এবং সেজন্য যথেষ্ট গর্ভও বোধ করেন।

জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়েও এসব মূর্তি, পুতুল, প্রতিমা যে প্রভূত পরিমাণে সম্মান, মর্যাদা, শ্রদ্ধা-ভক্তি পেয়ে আসছে রোডস্-এর সুবিশাল এবং বিশ্ববিখ্যাত পিতল-মূর্তি এবং পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশের উল্লেখযোগ্য ও জনবহুল স্থানসমূহে স্থাপিত দোর্দণ্ড প্রতাপ বীর শাসক এবং প্রখ্যাত জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিদের প্রস্তর বা অন্য ধাতবে নির্মিত মূর্তি বা প্রতিকৃতিসমূহই তার প্রকৃত প্রমাণ বহন করেছে। তাই বলছিলাম, ওরা খুবই ভাগ্যবান।

বলাবাহুল্য, মানুষ সৃষ্টির সেরা হয়েও এত শ্রদ্ধা ভক্তি করে এবং পূজার্চনা ভোগ-ভেট দিয়ে যাদের কৃপাদৃষ্টি লাভ করতে চায় তারা যে কত ভাগ্যবান সেকথা অনুমান করাও একটি কঠিন ব্যাপার।

এই তো গেল শিল্পী, ধার্মিক, সংস্কৃতিবান, রুচিশীল প্রভৃতি সজ্ঞান-সচেতন মানুষ এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শ্রদ্ধা সম্মান ও আদর কদর পাবার কথা।

অতঃপর অবোধ শিশুদের বেলায়ও আমরা দেখতে পাই যে, এসব মূর্তি এবং পুতুল-প্রতিমা একটি বিশেষ শ্রেণী অবোধ ও নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক শিশুদের খেলার সাথী এবং একান্ত আপনজন হিসেবে প্রাণঢালা ভালোবাসা এবং তাদের সোহাগ পেয়ে আসছে। তবে শিশুদের কথা স্বতন্ত্র, কেনন ওরা অবোধ এবং অবুঝ, অর্থাৎ ওদের জ্ঞানবুদ্ধি নেই। তাছাড়া ওদের এ পুতুল-প্রীতিও একান্ত রূপেই সাময়িক ব্যাপার। জ্ঞানবুদ্ধি পেলেই ওরা নিজেরাই একাজ থেকে সম্পূর্ণরূপে সরে দাঁড়ায় এবং কাজটা যে নিছক শিশুসুলভ ও বুদ্ধিহীনের ধীরে ধীরে তেমন একটা ধারণাও ওদের মন-মানসে গড়ে উঠতে থাকে।

অথচ আশ্চর্যের বিষয় এ শিশুরাই যখন জ্ঞান-বুদ্ধি ও বয়সের দিক দিয়ে যোগ্য ও সচেতন নাগরিক হয়ে গড়ে ওঠে তখনই এদেরই একটি বিশেষ শ্রেণী ধর্মীয় অনুষ্ঠান, বংশীয় ঐতিহ্য, মহাজনবাক্য, প্রচলিত প্রথা-পদ্ধতি প্রভৃতির দাবিতে একদা পরিত্যক্ত এ পুতুলকেই অতীব শ্রদ্ধাভক্তিসহকারে উপাস্যের

www.pathagar.com

আসনে বসায় এবং ভোগ-নৈবেদ্যাদি নানা উপচারের পূজা উপাসনায় মত্ত হয়ে ওঠে।

এ আশ্চর্যজনক পরিবর্তনের কি কারণ তা গভীরভাবে ভেবে দেখার প্রয়োজন যে রয়েছে সেসম্পর্কে দ্বিমতের কোনও অবকাশই থাকতে পারে না।

সুধী পাঠকবর্গের নিশ্চয়ই স্মরণ রয়েছে যে, ইতিপূর্বে ধার্মিকদের কথা বলতে গিয়ে আমরা তাঁদের একটি 'বিশেষ শ্রেণী'র কথা বলেছি। এখানে শিশুদের প্রসঙ্গে শেষপর্যায়ের একটি "বিশেষ শ্রেণী"র কথা বলা হলো।

এর কারণ, এরা ছাড়াও আর একটি 'বিশেষ শ্রেণীর' ধার্মিক ব্যক্তি রয়েছে যাঁরা এসব মূর্তি এবং পুতুল-প্রতিমার পূজার্চনা, ভোগ-ভেট নিবেদন, শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন প্রভৃতিকে অতি জঘন্য ধরনের পাপ এবং অবমাননাকর কাজ বলে অত্যন্ত গভীরভাবে বিশ্বাস পোষণ করেন। শুধু তা-ই নয় প্রাণের বিনিময়ে হলেও তাঁরা এ জঘন্য পাপ ও অবমাননাকর কাজের অবসান ঘটানোর পক্ষপাতি।

এখন অবস্থাটা হলো : প্রথমোক্ত শ্রেণীর ধার্মিক ব্যক্তিরা দ্বিতীয়োক্ত শ্রেণীর ধার্মিক ব্যক্তিদের এ মন-মানসিকতাকে ভীষণভাবে পাপজনক ও ক্ষতিকর বলে মনে করে আসছেন, আর দ্বিতীয়োক্ত শ্রেণী প্রথমোক্ত শ্রেণীর কাজ এবং মন-মানসিকতাকে ভয়ংকর ধরনের পাপ-জনক ও ক্ষতিকর বলে মনে করে চলেছেন।

অতীব দুঃখ এবং পরিতাপের সাথে বলতে হচ্ছে যে, শুধু মনে করার মধ্যেই বিষয়টি সীমাবদ্ধ থাকেনি। সেই প্রাচীনকাল থেকেই এ নিয়ে উভয় শ্রেণীর মধ্যে অপরিসীম ঘৃণা-বিদ্বেষ এবং দ্বন্দ্ব-কলহ চালু রয়েছে। এমনকি সময়ে সময়ে তা রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের রূপ নিয়ে পৃথিবীর মাটি ভীষণভাবে রক্ত-রঞ্জিত ও কলুষিত করেছে এবং আজও করে চলেছে।

বলাবাহুল্য, যেকোনও মূল্যে এই সংঘর্ষের অবসান ঘটানো প্রয়োজন। শান্তি প্রিয় এবং মানবতার কল্যাণকামী প্রতিটি মানুষই এ ভীষণ ও ভয়ংকর মানসিকতার স্থায়ী এবং সন্তোষজনক অবসান কামনা করেন।

অথচ তেমন কোনও উদ্যোগ পরিলক্ষিত হচ্ছে না। বরং অবস্থা দৃষ্টে একথা মনে হওয়াই স্বাভাবিক যে, সত্যের উদ্ঘাটন এবং প্রতিটি অন্তরে সেই সত্যের প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে উভয় শ্রেণীর অন্তত একটা উল্লেখযোগ্য অংশ বিভ্রান্তের মতো অন্ধ আবেগে ছুটে চলেছেন। আর বাকি অংশের কেউবা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে চলেছেন, আর কেউবা গোঁজামিলের সাহায্যে এ ভীষণ ও ভয়ংকর মানসিকতার মধ্যে মিলন ঘটানোর ব্যর্থ প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন।

আমরা মনে করি যে, এ অন্ধ আবেগ, নীরব দর্শকের ভূমিকা এবং গোঁজামিলের সর্বনাশা পথ ছেড়ে দিয়ে সত্য উদ্ঘাটনের সাধনায় আত্মনিয়োগ

www.pathagar.com

করা আবশ্যক। কেননা সত্যের উদ্ঘাটন করতে সেই সত্যকে প্রতিটি মানুষের অন্তরে সফল ও সার্থকভাবে প্রতিষ্ঠা করা ছাড়া অন্য কোনওভাবে বা অন্যকোনও পথে এ মানসিকতার স্থায়ী ও সন্তোষজনক পরিবর্তন সম্ভব নয় বলে আমরা দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করি।

এখানে সত্যের উদ্ঘাটন বলতে কবে, কেন এবং কিভাবে মূর্তি ও পুতুল-প্রতিমার উদ্ভব ঘটানো হয়েছে এবং মানুষ নিজেকে সৃষ্টির সেরা বলে জানা সত্ত্বেও ধার্মিক বলে পরিচিত মানুষদের একটি বিশেষ শ্রেণী সেই প্রাচীনকাল থেকে কেন এবং কোন যুক্তিতে প্রাণ-প্রজ্ঞাহীন জড়পিণ্ড সদৃশ মূর্তি ও পুতুল-প্রতিমাকে উপাস্যের সুমহান মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন আর অন্য বিশেষ শ্রেণীটিইবা কি কারণে এবং কোন্ যুক্তি বলে এ কাজের চরম বিরোধিতা করে চলেছেন এখানে সেকথাই আমরা বোঝাতে চাচ্ছি।

এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে, দুটিই চরমপন্থী দল। কেননা এক দলের বিশ্বাস মূর্তি এবং পুতুল-প্রতিমা পূজার মতো এমন পুণ্যজনক কাজ আর হতেই পারে না। সুতরাং যেকোনও মূল্যে এমনকি জীবন দিয়ে হলেও এ কাজকে বহাল রাখতে হবে। আর এ বহাল রাখতে গিয়ে যদি মৃত্যুবরণ করতে হয় তবে সে-মৃত্যু হবে গৌরবের মৃত্যু এবং সরাসরি স্বর্গলাভের উপায়।

পক্ষান্তরে অন্য দলটির বিশ্বাস মূর্তি ও পুতুল-প্রতিমা পূজার মতো এমন জঘন্য ও অবমাননাকর কাজ পৃথিবীতে আর নেই। সুতরাং যে-কোনও মূল্যে একাজকে বন্ধ করা প্রয়োজন আর এ প্রয়োজন মিটাতে গিয়ে যদি মৃত্যুবরণ করতে হয় তবে সে-মৃত্যু ইহ-পরকালের পরম গৌরব ও চরম সাফল্য বয়ে আনবে।

এ দুপক্ষের বিশ্বাসই সত্য হতে পারে না। কোনটি সত্য? নিরপেক্ষ মন নিয়ে এবং সকল প্রকারের ভাবপ্রবণতার ঊর্ধ্বে উঠে তা যাচাই করে দেখতে হবে এবং সত্যকে যথার্থভাবে ও বিজ্ঞতার সাথে উভয় পক্ষের কাছে তুলে ধরতে হবে।

এ কাজটি যে খুবই জটিল, কষ্টসাধ্য এবং ধৈর্য-সাপেক্ষ সেকথা খুলে বলার প্রয়োজন হয় না। যথেষ্ট বাধাবিঘ্নের আশংকাও রয়েছে। কিন্তু যত কষ্ট-সাধ্য এবং বিপদ-সংকুলই হোক, মানবতার বৃহত্তর স্বার্থে আমাদের দৃঢ় পদক্ষেপে এ কাজে এগিয়ে যেতে হবে।

কোনও কিছুর মূল বা গোড়ায় না গিয়ে তার সঠিক পরিচয় পাওয়া যে সম্ভব নয় সেকথা প্রায় সকলেরই জানা রয়েছে। অতএব এ ব্যাপারেও আমাদের গোড়া বা মূল থেকেই কাজ শুরু করতে হবে। সে-কারণেই গ্রন্থের নাম দেয়া হয়েছে 'মূর্তিপূজার গোড়ার কাথা।'

www.pathagar.com

কিন্তু অসুবিধা হলো, মূর্তি এবং পুতুল-প্রতিমার উদ্ভব ঘটেছে কয়েক হাজার বছর পূর্বে। ফলে এ-বস্তু পর্কীয় বহু তথ্য-উপাত্তই কালের প্রবাহে ভেসে গিয়েছে অথবা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সুতরাং ওসবের যতটুকু খুঁজে পাওয়া সম্ভব তার ওপর ভিত্তি করেই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।

এ কাজে আর যেসব অসুবিধা রয়েছে তার অন্যতম প্রধানটি হলো গোড়াপত্তন হওয়ার পর থেকে হাজার হাজার বছরে বংশানুক্রমিক এবং সত্য সনাতন বলে এ-সম্পর্কীয় ধারণা বিশ্বাসগুলো যাদের মন-মগজে গভীর ও কঠোরভাবে শেকড় গেড়ে বসেছে তাদের মন-মগজকে সত্যাভিমুখীকরণ।

কেননা, এমন বহু মানুষই পাওয়া যাবে যাঁরা সত্যকে সত্য বলে জানার পরেও নানা অজুহাতে সে-সত্যকে গ্রহণ করতে রাজি হবেন না।

তবে একথাও সত্য এবং বাস্তব-সম্মত যে মানুষের মন সত্যানুসন্ধিৎসু। সত্যকে সার্থকভাবে তুলে ধরতে পারলে ভীষণ হঠকারী ব্যক্তিও মনে মনে তা গ্রহণ না করে পারে না। ফলে মাঝে মাঝেই তাকে বিবেকের দংশন অনুভব করতে হয়। আর এ বিবেকের দংশনই তাকে সত্যগ্রহণে বাধ্য বা অনুপ্রাণিত করে।

কোনও কোনও ক্ষেত্রে এর যে ব্যতিক্রম হয় না এতদ্বারা অবশ্যই সেকথা আমরা বোঝাতে চাচ্ছি না। বরং এতদ্বারা আমরা একথাই বোঝাতে চাচ্ছি যে, কেউ গ্রহণ করুক বা না করুক সত্যকে সত্য বলে এবং সার্থকভাবে তুলে ধরতে পারলেই আমরা আমাদের কর্তব্য সমাধা হয়েছে বলে মনে করবো।

এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে, সত্যকে তুলে ধরার যথাযোগ্য উদ্যোগের অভাব থাকলেও মূর্তিপূজাবিরোধী একটা মানসিকতা যেন সর্বত্রই মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে।

উদাহরণস্বরূপ আধুনিক কালের উন্নত দেশগুলোর কথা বলা যেতে পারে। সেসব দেশের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-সভ্যতা অতীতের অন্ধকারকে যতই অপসারিত করে চলেছে ততই সেসব দেশের মানুষ মূর্তিপূজাকে অবিজ্ঞজনোচিত, বর্বরযুগীয়, সেকেলে, প্রগতির শত্রু প্রভৃতি আখ্যা প্রদান করে একাজ থেকে ক্রমান্বয়ে দূরে সরে দাঁড়াচ্ছে।

এ থেকে জনমত কোনদিকে চলছে তার একটা সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া গেলেও এর প্রতি কোনও গুরুত্ব আরোপের ইচ্ছা আমাদের নেই।

কেননা, তাদের এসব মন্তব্য এবং সরে দাঁড়ানোর আসল কারণ কি তা আমাদের কাছে সুস্পষ্ট নয়।

তবে তাঁরা যদি প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করে সত্যের প্রেরণায় একাজ করে থাকেন তবে তাঁরা নিশ্চিতরূপেই আমাদের ধন্যবাদার্হ।

www.pathagar.com

কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি যে, ওদের কেউবা মূর্তিপূজার বিরোধী হতে গিয়ে গোটা ধর্মেরই বিরোধী হয়ে উঠেছেন এবং পৃথিবীর বুক থেকে ধর্মকে নির্মূল করার সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছেন।

কেউবা মূর্তিপূজা ছাড়তে গিয়ে নিজেরা ধর্মনিরপেক্ষ সেজেছেন এবং ধর্মকে পৃথিবীর সকল কাজ থেকে অবসর দিয়ে উপাসনালয়ের চার দেয়ালের মধ্যে বন্দি করে "যেমন ইচ্ছা তেমন চল" এবং 'খাও দাও মজা ওড়াও' এ নীতি গ্রহণ করেছেন।

আবার কেউবা মূর্তিপূজা ছেড়ে দিয়ে আত্মপূজায় বিশেষভাবে মনোযোগী হয়ে উঠেছেন।

বলাবাহুল্য, এসব কাজ বিশেষ করে তাদের মূর্তিপূজার বিরোধিতাকে আমরা দ্বিধাহীন চিত্তে সত্যানুভূতি-প্রসূত বা সত্যের প্রেরণা-সঞ্জাত বলে মেনে নিতে পারি না।

বরং আমরা মনে করি যে, প্রতিটি চিন্তাশীল ব্যক্তিই তাঁদের এ মূর্তিপূজা-বিরোধী মানসিকতা গড়ে ওঠার পেছনে সত্যের চেয়ে অন্ধ আবেগ, ধর্মবিদ্বেষ এবং উগ্র আধুনিকতাই বিশেষভাবে কার্যকর ছিল এবং রয়েছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

অতএব তাঁদের এ মূর্তিপূজা-বিরোধিতার প্রতি আমরা কোনওরূপ গুরুত্ব আরোপ করতে চাইনা। মূর্তিপূজাবিরোধী মানসিকতা যে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে শুধু সে-কথাটুকুকে সুধী পাঠকবর্গ সমীপে তুলে ধরার উদ্দেশ্যেই আমাদের এ প্রসঙ্গের অবতারণা করতে হলো।

পরিশেষে এটুকু বলেই অন্য প্রসঙ্গে যেতে চাই। আমরা মূর্তিপূজার মূল অর্থাৎ গোড়ার কথা অবহিত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্তসমূহ সাধ্যানুযায়ী খুঁজে বের করতে চেষ্টা সাধনা চালিয়ে যাবো এবং যা কিছু সংগ্রহ করা সম্ভব হয় সেগুলোকে পরস্পর বিবদমান দুটি শ্রেণীর কাছে তুলে ধরবো এবং আশা করবো যে, তাঁরাও শান্তি, কল্যাণ ও মানবতার বৃহত্তর স্বার্থে আমাদের উপস্থাপিত তথ্য উপাত্তসমূহ বিশেষভাবে অনুধাবন করে সত্য বেছে নেয়ার চেষ্টা করবেন।

তবে এজন্য তাদের অবশ্যই সকল প্রকার ভাব-প্রবণতা ও কুপমণ্ডুকতাকে পরিহার করে নিরপেক্ষ সত্যানুসন্ধিৎসু মন নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

আমরা ইতোপূর্বে প্রায় সর্বত্রই মূর্তি, প্রতিমা এবং পুতুল এবং তিনটি শব্দ বা তিনটি নাম এক সঙ্গে তুলে ধরেছি।

এই তিনটি শব্দ বা তিনটি নামের পৃথক পৃথক তাৎপর্য রয়েছে। অনেকেই এ তাৎপর্যের কথা জানেন না। ফলে বিভ্রান্তিতে পড়েন।

www.pathagar.com

এ বিভ্রান্তির কারণেই "পৌত্তলিক" এবং "পৌত্তলিকতা" শব্দদ্বয়ের উদ্ভব হয়েছে। অর্থাৎ মূর্তি, প্রতিমা ও এ-উভয়ের পূজকদের বলা হয়— "মূর্তিপূজক"। অথচ মূর্তি এবং প্রতিমা এক কথা নয়।

অনুরূপভাবে মূর্তি, প্রতিমা এবং পুতুল এ তিনের পূজকদের পাইকারীভাবে "পৌত্তলিক" এবং তাঁদের এ কাজকে "পৌত্তলিকতা" বলা হয়ে থাকে। অথচ মূর্তি এবং প্রতিমা বলতে কোনওক্রমেই পুতুলকে বোঝায় না।

এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে, এমন অনেকেই রয়েছেন যারা নিজেদের মূর্তিপূজক বা পৌত্তলিক বলে পরিচয় দিতে রাজি নন। এ পরিচয়ে সম্বোধন করলে তাঁরা অনেকে রুষ্টও হয়ে ওঠেন। তাঁদের মতে, তাঁরা 'প্রতিমা-পূজক', অথচ তাদের এ দাবি সর্বোতভাবে সত্য নয়। কেন সত্য নয় এবং তারা যে প্রকৃতপক্ষে প্রতিমার নামে বিভিন্ন দেবতার মূর্তিকেই উপাস্য জ্ঞানে পূজা করে থাকেন অতঃপর সে-প্রমাণই তুলে ধরা হবে। আর এ করতে গিয়ে প্রথমেই আমরা মূর্তি, প্রতিমা, পুতুল, দেবতা প্রভৃতি শব্দ বা নামের তাৎপর্য পৃথক পৃথকভাবে তুলে ধরবে।

পরিশেষে আমরা নিরপেক্ষ, সত্যানুসন্ধিৎসু এবং সহযোগী মানসিকতা নিয়ে পরবর্তী আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য প্রতিটি শান্তিপ্রিয় ও কল্যাণকামী মানুষকে আন্তরিক আহ্বান জানিয়ে প্রসঙ্গের ইতি টানছি।

মূর্তি শব্দের তাৎপর্য

অভিধানের মতে : মূর্তি (র্ত) ১। আকৃতি, শরীর-কায় অঙ্গ, অবয়ব, প্রতিমা, দ্রব্য, পঞ্চভূত স্বরূপ। মূর্ছ + ক্তি কর্ত্তৃবা। ২। কাঠিন্য, [মূর্ছ + ক্তি ভাবে বি; স্ত্রী।]

অতএব মূর্তি শব্দের মোটামুটি তাৎপর্য দাঁড়াচ্ছে : যে বস্তুর মাধ্যমে পরিচিত কোনও প্রাণীর চেহারা বা অবয়ব 'মূর্তি' বা প্রতিকৃতি প্রকট হয়ে ওঠে সেই বস্তুকে উক্ত প্রাণীর মূর্তি বলা হয়ে থাকে।

এখানে 'প্রাণী' বলতে সাধারণত মানুষ, জীব-জন্তু প্রভৃতির কথাই বুঝতে হবে। মূর্তি সম্পর্কে কতিপয় জ্ঞাতব্য বিষয় :

(ক) যার মূর্তি বানানো হবে মূর্তির মাধ্যমে তার বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসহ গোটা অবয়বটাই মূর্ত হয়ে উঠতে হবে। তবে বিশেষভাবে পরিচিত কোনও মানুষ বা জীবজন্তুর বেলায় তাকে সহজে চিনতে পারা যায় এমন ধরনের উত্তমাঙ্গ

www.pathagar.com

যেমন আবক্ষ মুখমণ্ডল বা শুধু মুখমণ্ডলের মূর্তি নির্মাণ এবং ব্যবহারের নিয়মও চালু রয়েছে।

(খ) মূর্তি আসল অবয়বের চেয়ে ছোট, বড়, মাঝারি প্রভৃতি যেকোনও আকারের হতে পারে।

(গ) দর্শক বা দর্শকদের কাছে পূর্ব থেকে পরিচয় রয়েছে এমন জীবজন্তু এবং মানুষের মূর্তিই সাধারণত নির্মাণ করা হয়। কেননা যার বা যাদের সম্পর্কে কোনও ধারণাই নেই এমন কিছুর মূর্তি দর্শকদের কাছে অর্থবহ হতে পারে না।

(ঘ) পরিচয় রয়েছে এমন যেকোনও এক জাতীয় প্রাণীর একটি মাত্র মূর্তিই গোটা জাতির প্রতিভূ হিসেবে উপস্থাপিত করা যেতে পারে। তবে সেই জাতীয় প্রাণীর মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী থাকলে সেই শ্রেণীর প্রতিভূ হিসেবে ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি উপস্থাপিত করতে হয় এবং প্রতিটি মূর্তির দেহে নিজ নিজ শ্রেণী বৈশিষ্ট্যের চিহ্নকে প্রকট করে তুলতে হয়।

(ঙ) প্রখ্যাত ব্যক্তি, একান্ত আপনজন, বিশেষ ধরনের জন্তু-জানোয়ার প্রভৃতির বেলায় শুধুমাত্র মুখমণ্ডল বা আবক্ষ মুখমণ্ডলের মূর্তিই যথেষ্ট বলে বিবেচিত হয়ে থাকে।

অন্য কথায় বলা যেতে পারে, বাস্তবে যা নেই বা যার অবয়ব কোনও কিছুর মাধ্যমে মূর্ত বা প্রকট করে তোলা সম্ভব নয় তার মূর্তি নির্মাণও সম্ভব নয়।

প্রতিমা শব্দের তাৎপর্য

অভিধান মতে : ১. প্রতিমূর্তি বিগ্রহ, গঠিত দেবমূর্তি, হস্তীদন্তদ্বয়ের মধ্যভাগ, গজদন্তবন্ধ। [প্রতি + মা + ঙ্ কর্ম্মবা + আপ্]

২. সাদৃশ্য। [প্রতি + মা + ঙ্ ভাবে।]

৩. প্রতিবিম্ব। [প্রতি + মা + ঙ্ করণ] বি; স্ত্রী।

প্রতিমা শব্দটির মোটামুটি তাৎপর্য হলো প্রতিম বা অনুরূপ। শব্দটি স্ত্রী-লিঙ্গ বাচক হলেও পুংলিঙ্গে এর ব্যবহার প্রচলিত রয়েছে।

এক হিসেবে প্রতিমাও মূর্তি ব্যতীত অন্য কিছু নয়। কিন্তু পার্থক্য হলো আসল দেহের উচ্চতা, স্থূলতা প্রভৃতির সাথে মূর্তির বিশেষ কোনও সম্পর্ক থাকে না। মূর্তি ছোট, বড়, মাঝারি প্রভৃতি যে-কোনও আকারের হতে পারে। শুধু মুখমণ্ডল বা আবক্ষ মুখমণ্ডলেরও মূর্তি হতে পারে।

www.pathagar.com

কিন্তু প্রতিমার বেলায় তেমনটি হওয়ার সামান্যতম সুযোগও নেই। প্রতিমাটিকে অবশ্যই আসল দেহের উচ্চতা, স্থূলতা, বর্ণ, হাত, পা, চোখ, নাক প্রভৃতি সকল দিক দিয়ে হুবহু হতে হবে। বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে, প্রতিম বা অনুরূপ না হলে তা 'প্রতিমা' হতে পারে না; মূর্তির পর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়ে।

সাধারণত এ কারণেই মূর্তিকে প্রতিমা বলা হয় না; অথচ প্রতিমাকে মূর্তি বলা হয়। বলাবাহুল্য, একই প্রতিমার বৈশিষ্ট্য এবং এ কারণেই এসবের পূজকেরা নিজেদের 'প্রতিমাপূজক' বলে পরিচয় দিতে আগ্রহী।

এখানে বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে, মানুষ বা জন্তু-জানোয়ারের মূর্তিকে মূর্তিই বলা হয়, সেটা যদি আসল অবয়বের অনুরূপও হয় তবুও 'প্রতিমা' বলা হয় না।

এর কারণ হলো সাধারণত মূর্তি তো আসলের অনুরূপ হুবহু হয়ই না তদুপরি প্রতিম বা অনুরূপ হতে হলে শুধু অবয়ব হলেই চলে না। প্রাণও থাকতে হয়। অন্যথায় সকল দিক দিয়ে অনুরূপ হলেও প্রাণের দিক দিয়ে খুৎ থেকে যায়। সুতরাং যথার্থ অর্থে তাকে প্রতিমা বলে আখ্যায়িত করা যেতে পারে না।

সে-কারণেই পূজার এক পর্যায়ে পুরোহিত মূর্তিটির বক্ষদেশে হস্তার্পণ করে আবাহন ও প্রাণপ্রতিষ্ঠার নির্দিষ্ট মন্ত্রটি উচ্চারণ করতে থাকেন। মন্ত্র পাঠ শেষ হলে ধরে নেয়া হয় যে, মূর্তিটির মধ্যে সংশ্লিষ্ট দেবতার প্রাণ সমাগত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বলাবাহুল্য, এ পর্যায়েই বাইরের অবয়ব এবং ভেতরের প্রাণ ও উভয় দিক দিয়ে তা আসলের প্রতিম বা অনুরূপ হয়ে ওঠে এবং 'প্রতিমা' বলে আখ্যায়িত হয়।[১]

প্রাণপ্রতিষ্ঠার মন্ত্রটি পাঠ করার পরে সংশ্লিষ্ট দেব বা দেবীর উদ্দেশ্যে পাদ্য, অর্ঘ্য, স্নানীয়, আচমনীয়, ভোগ নৈবেদ্য প্রভৃতি উৎসর্গের মাধ্যমে যথারীতি পূজার কাজ সমাধা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরোহিত নিজ হস্ত দ্বারা প্রতিমাটিকে কিছু নাড়া দেন এবং বলেন— "গচ্ছ দেবী (অথবা দেবঃ) যথেচ্ছয়া"। অর্থাৎ— 'হে দেবী (অথবা দেব) যথা ইচ্ছা গমন কর।'

প্রতিমাটি মাটির গড়া হলে কোনও কোনও প্রতিমার বেলায় অতঃপর তাকে খাল, বিল, নদী প্রভৃতি যে-কোনও জলাশয়ে বিসর্জন করা বা ফেলে দেয়া হয়। অন্যান্যদের বেলায় সারা বছর পূজা-মণ্ডপে পূজার্চনাহীনভাবে রেখে দেয়া হয়। বছর শেষে নির্দিষ্ট দিনে তাকে আশেপাশে কোথাও ফেলে দিয়ে তদস্থানে নতুন প্রতিমা স্থাপন ও পূজার্চনার পরে সে একই অবস্থার পূনরাবৃত্তি ঘটানো হয়।

---

১. পুরোহিত দর্পণ, হিন্দুসর্বস্ব, নিত্যকর্ম পদ্ধতি।

www.pathagar.com

এর একটি মাত্র কারণই থাকতে পারে। আর তা হলো 'গচ্ছদেবী যথেচ্ছায়া' বলে সংশ্লিষ্ট দেব বা দেবীকে বিদায় দেয়ার পরে প্রতিমাটি আর প্রতিমা থাকে না— প্রাণহীন মূর্তিতে পরিণত হয়। যার ফলে বিসর্জন বা পূজার্চনাহীনভাবে রাখা এবং ফেলে দেয়াকে মোটেই দোষণীয় বা সংশ্লিষ্ট দেবতার পক্ষে অবমাননাকর মনে করা হয় না।

এ মন্ত্র পাঠের ফলে প্রতিমাটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে কি না সেকথা আমরা জানি না। জানার সাধ্যও আমাদের নেই। কারণ ওটা একান্তরূপেই আধ্যাত্মিক ব্যাপার এবং বিশ্বাসের বিষয়।

একথা বলাই বাহুল্য যে, কোনও কিছুর প্রতি বিশ্বাস করা আর না করাটা একান্তরূপেই মনের কাজ, আর মনের ওপরে জোর করে কোনও বিশ্বাসকে চাপিয়ে দেয়া যায় না।

সুতরাং এভাবে প্রতিমার মধ্যে দেবতার প্রাণপ্রতিষ্ঠাকে কেউবা সম্ভব বলে বিশ্বাস করবেন আর কেউবা তা করবেন না। এ নিয়ে তৃতীয় পক্ষের কোনও বক্তব্য থাকা উচিত নয়। তথাপি কেউ যদি কোনও বক্তব্য রাখেন তবে সেটাকে অপরের ন্যায়সঙ্গত অধিকারের ওপরে অন্যায় হস্তক্ষেপ ছাড়া আর কিছুই বলা যেতে পারে না।

পৃথিবীতে এমন মানুষের অভাব নেই যারা মনে মনে ভাবেন যে, একই লগ্নে একই দেবতার হাজার হাজার বাড়িতে পূজা হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় সংশ্লিষ্ট দেবতার একটি মাত্র প্রাণ একই সময়ে হাজার হাজার বাড়িতে বিদ্যমান মূর্তির মধ্যে তাঁর উপস্থিতি কোনওক্রমেই সম্ভব হতে পারে না।

আর এমন মানুষও যথেষ্টই রয়েছেন যাঁরা বলবেন : দেবতারা মানুষ নন; তাঁরা হলেন অলৌকিক ও অতি মানবিক শক্তির অধিকারী। অতএব একই সময়ে হাজার হাজার প্রতিমার মধ্যে তো বটেই .এমনকি লক্ষ লক্ষ প্রতিমার মধ্যেও তাঁদের উপস্থিতি সম্ভব।

তবে কেউ কেউ এটাকে 'অন্ধ-বিশ্বাস' বলে মন্তব্য করতে পারেন। মোটকথা এ নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মানুষ নিজ নিজ জ্ঞান-বিশ্বাস অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন রূপ ভাবনা চিন্তা করতে পারেন এবং এ অধিকার তাঁদের রয়েছে।

কেউ হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন যে, এমনিভাবে স্বাধীনতা দিলে তো মতভেদ, কোন্দল, রক্তপাত এবং অশান্তি লেগেই থাকবে। তা থেকে বাঁচার উপায় কি?

তাঁদের এ প্রশ্নের উত্তরে বিনয়ের সাথে বলা যাচ্ছে যে, এর একমাত্র উপায় সত্যের উদ্ঘাটন এবং সেই সত্যকে সার্থকভাবে সকলের কাছে তুলে ধরা আর সেটা-ই হলো 'মূর্তিপূজার গোড়ার কথা' লিখার একমাত্র উদ্দেশ্য।

www.pathagar.com

মূর্তির মাঝে দেবতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা সম্ভব কি না সেসম্পর্কে পরবর্তী শব্দের তাৎপর্য' শীর্ষক নিবন্ধে সংক্ষেপে আলোকপাতের চেষ্টা করা অতএব এখন আর সেদিকে না গিয়ে আমরা আবার প্রতিমার প্রসঙ্গে যাচ্ছি।

এখানে একটি বাস্তব উদাহরণ তুলে ধরা যাচ্ছে যা থেকে প্রতিমা এবং মূর্তির পার্থক্য অতি সহজেই বুঝতে পারা যাবে।

আমাদের দেশে প্রতি বছরই মহা ধুমধামের সাথে দুর্গোৎসব পালিত হয়ে আসছে। দুর্গা, তৎপুত্র কার্তিক, গণেশ এবং কন্যা লক্ষ্মী, সরস্বতী এই পাঁচটিকে বলা হয় প্রতিমা।

পূজার সময়ে এদের প্রত্যেকের বেলায় নির্দিষ্ট নিয়মে আবাহন ও প্রাণপ্রতিষ্ঠার মন্ত্র পাঠ করা হয়।

অথচ এ পাঁচ দেবদেবীর বাহন যথাক্রমে সিংহ, ময়ূর, ইঁদুর, পেঁচা, হাঁস এবং যুদ্ধরত মহিষাসুর ও নব পত্রিকার প্রতীক রূপী 'কলাবউ' এদের কোনওটিকে প্রতিমা বলা হয় না— এদের জন্য আবাহন এবং প্রাণপ্রতিষ্ঠার মন্ত্রও পাঠ করা হয় না। কারণ তাদের একটিও দেবদেবীর পর্যায়ভুক্ত নয়। অতএব এগুলোকে বলা হয় মূর্তি। যেমন দুর্গা-প্রতিমা, লক্ষ্মী-প্রতিমা, সিংহ-মূর্তি, অসুর মূর্তি, পেঁচার মূর্তি, হাঁসের মূর্তি প্রভৃতি।

মূর্তি এবং প্রতিমার মধ্যে যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে আশা করি এরপর সেকথা বুঝতে আর কোনও অসুবিধা হবে না।

অন্তত আমাদের এ উপমহাদেশের হিন্দুসমাজ যে মূর্তি এবং প্রতিমা এ উভয়ের পূজাই করে থাকেন এ থেকে সুস্পষ্টরূপে সেকথা বুঝতে পারা যাচ্ছে।

এ দুটি ছাড়া পুতুলেরও পূজা তাঁরা করেন কি না পরবর্তী 'পুতুল শব্দের তাৎপর্য', শীর্ষক নিবন্ধে সেসম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

এখানে সুধী পাঠকবর্গ অবশ্যই প্রশ্ন করতে পারেন যে, যেহেতু তাঁরা সাথে সাথে প্রতিমার পূজাও করেন এবং যেহেতু প্রতিমা পূজাই তাঁদের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়ে আসছে, এমতাবস্থায় এ পুস্তকের নাম 'প্রতিমাপূজার গোড়ার কথা' না রেখে 'মূর্তিপূজার গোড়ার কথা' রাখা হলো কেন

এ পুস্তকের দীন লেখক হিসেবে এ 'কেন'র উত্তর অবশ্যই আমার দেয়া উচিত। এ নাম রাখার একটি বিশেষ তাৎপর্য যে রয়েছে সেকথা বলাই বাহুল্য। অন্য কারো পক্ষে এ প্রশ্নের উত্তর দেয়া এবং তাৎপর্যের ব্যাখ্যা প্রদান অসম্ভব না হলেও খুবই কঠিন।

তাছাড়া মূর্তি এবং প্রতিমা সম্পর্কে ওপরে যেসব তথ্যাদি তুলে ধরা হলো ভালো করে খোঁজখবর নিলে দেখা যাবে যে, আধুনিকতার প্রবল স্রোত এবং ধর্ম-

www.pathagar.com

নিরপেক্ষতার আবর্তে দিশেহারা সমাজের মাত্র দু'চারজন ছাড়া এ-সবের কোনও খবরই তাঁরা রাখে না। এমনকি তার প্রয়োজনও বোধ করেন না।

এমতাবস্থায় এ পুস্তকের নামকরণের তাৎপর্য নিয়ে তাঁরা নিজেদের মাথা ঘামাবেন এটা কি করে আশা করা যেতে পারে? নামকরণের তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করতে হলে প্রতিমা সম্পর্কীয় তিনটি কথা আমাদের অবশ্য স্মৃতিপটে জাগরুক রাখতে হবে। সে-কথা তিনটি হলো :

০ যেহেতু 'প্রতিমা' শব্দের তাৎপর্যই হলো— 'প্রতিমা' বা 'অনুরূপ', অতএব প্রতিমাটিকে অতি অবশ্যই সংশ্লিষ্ট দেব বা দেবীর আসল অবয়বের দৈর্ঘ্য, স্থূলতা, চোখ, মুখসহ প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, দেহের বর্ণ প্রভৃতির প্রতিমা বা অনুরূপ হতে হবে।

০ যেহেতু প্রাণহীন প্রতিমা মূর্তি সদৃশ, অতএব ধরে নিতে হবে যে, পুরোহিত কর্তৃক আবাহন ও প্রাণপ্রতিষ্ঠার মন্ত্র পাঠিত হওয়ার সাথে সাথে মূর্তিটির মধ্যে সংশ্লিষ্ট দেব বা দেবীর প্রাণ সমাগত হয়ে ভেতরে-বাইরে উভয় দিক দিয়েই মূর্তিটিকে প্রতিম অর্থাৎ প্রতিমায় পরিণত করেছে। এ 'ধরে নেয়ার' কাজটা সকলের পক্ষে সহজ ও সম্ভব কিনা সেকথাও এ-প্রসঙ্গে ভেবে দেখতে হবে।

০ যেহেতু প্রতিমা অর্থ প্রতিম বা অনুরূপ অতএব কোনও দেব বা দেবীর যতগুলো প্রতিমা নির্মিত হবে সে-সবগুলোকে হুবহু একইরূপ হতে হবে। যদি কোনওটির মধ্যে সামান্যতম ব্যতিক্রমও পরিলক্ষিত হয় তবে সেটিকে কোনওক্রমেই প্রতিমা বা অনুরূপ প্রতিমা বলা যাবে না।

এ তিনটি কথাকে মনে রেখে আমরা যদি আমাদের আশেপাশে বিদ্যমান প্রতিমাসমূহের প্রতি লক্ষ্য করি তবে সম্পূর্ণ ভিন্ন অবস্থাই আমরা দেখতে পাবো।

উদাহরণস্বরূপ লক্ষ্মী-প্রতিমার কথাই ধরা যাক। এ উপমহাদেশে প্রতিবছর হাজার হাজার লক্ষ্মী-প্রতিমা নির্মিত ও পূজিত হয়ে আসছে। লক্ষ্মীদেবীর আসল চেহারার সাথে সামান্যতম পরিচয়ও আমাদের নেই। অন্য কারো সে-ভাগ্য হয়েছিল কিনা সেকথাও আমাদের জানা নেই। তাঁর আসল চেহারা বা অবয়ব সম্পর্কে কোনওরূপ আন্দাজ অনুমানে উপনিত হওয়াও আমাদের সাধ্যাতীত।

এমতাবস্থায় আমাদের চোখের সম্মুখে বিদ্যমান প্রতিমার সাথে লক্ষ্মীদেবীর আসল চেহারা হুবহু মিলে যায় কিনা তা পরখ করে দেখার সাধ্যও আমাদের নেই।

এ-সংকট নিরসনের জন্য কোনও এক বাড়ির প্রতিমাকে যদি লক্ষ্মী দেবীর প্রতিমা বা অনুরূপ বলে ধরে নিয়ে আমরা অন্য বাড়িতে বিদ্যমান প্রতিমার চোখ-

www.pathagar.com

মুখের গড়ন, হাতের বীণাযন্ত্রটি, উক্ত যন্ত্রটি ধারণের ভঙ্গি, প্রভৃতির কোনও না কোনও দিক দিয়ে কিছু না কিছু পার্থক্য আমাদের চোখে পড়ে।

অন্তত দেহ-বর্ণের দিক দিয়ে একটিকে ধপধপে সাদা, অন্যটিকে কিছুটা ফ্যাকাশে রং-এর দেখা যায়। এমনিভাবে হাজার হাজার লক্ষ্মী-প্রতিমার প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করলে একটির সাথে অন্যটির কিছু না কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

এমতাবস্থায় এ হাজার হাজার প্রতিমার কোনটি যে লক্ষ্মী দেবী-প্রতিমা বা অনুরূপ অথবা কোনটি যে লক্ষ্মী দেবীর প্রতিম বা অনুরূপ অথবা কোনওটিই প্রতিমা বা অনুরূপ কিনা তা নির্ণয় করা কোনওক্রমেই আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না।

বলাবাহুল্য, এ পার্থক্যের কারণে ওসবের কোনওটিকেই নির্দ্বিধায় লক্ষ্মী-দেবীর আসল অবয়বের প্রতিম বা অনুরূপ অন্য কথায় প্রতিমা বলা যেতে পারে না। প্রতিম বা অনুরূপ না হলে সেগুলোকে যে মূর্তি বলা হয়ে থাকে ইতোপূর্বের আলোচনা থেকে সেকথা আমরা জানতে পেরেছি। অতএব এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, প্রতিমা বলে দাবি করা হলেও আসলে ওগুলো মূর্তি ছাড়া কিছু নয়। তাছাড়া তথাকথিত প্রতিমা ছাড়া তাঁরা যে মূর্তিপূজাও ক'রন ইতোপূর্বের আলোচনা থেকে সে প্রমাণও আমরা পেয়েছি।

পুতুল শব্দের তাৎপর্য

অভিধান মতে পুতুল— খেলার পুতুল, মাটি-পাথরের তৈরি মানুষ, পশুপাখির প্রতিমূর্তি, নয়নমণি, আদরের বাচ্চা, প্রিয়বস্তু, পুত্তল বা পুত্রিকা, বি। পুত্তলি-পুত্তলিকা, পুত্তলি-পুতুল, মাটির প্রতিমূর্তি (প্রাণিবিদ্যা) কীটাদির মুক-অবস্থা।

পুত্ত— লা (গ্রহণ করা) + ডি কর্ত্তৃ, ৩য় পক্ষে পুত্তলি + ঈপ, ২য় পক্ষে পুত্তলী + কণ্ স্বার্থে + আপ্। বি; স্ত্রী।

পুত্তলিকা — ছোট পুতুল; পুত্তলী + কণ্ স্বার্থে + আপ। বি; স্ত্রী।

পুত্তলীপূজক— যে মূর্তিপূজা করে এমন, পৌত্তলিক। ৬ষ্ঠী তৎ। বিণ। স্ত্রী— পুজিকা।

বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, প্রত্যহ পূজা করা হয় এমন কিছুসংখ্যক দেবদেবীর মূর্তি বা প্রতিমা রয়েছে।

www.pathagar.com

প্রত্যহ পূজার সময় এ সবকে স্নান করানো, মোছানো, চন্দন মাখানো। নির্দিষ্ট আসনে বসানো বা স্থাপন করা এবং রাতে নির্দিষ্ট বিছানায় শোয়ানোর নিয়ম রয়েছে।

মাটির মূর্তি বা প্রতিমাদের স্নান করানো হয় না। মন্ত্র পাঠ করে স্নানের জল নির্দিষ্ট পাত্রে নিক্ষেপ করতে হয়। এসব মূর্তি বার্ষিক পূজায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

গৃহ-দেবতা বা নিত্য নৈমিত্তিক পূজায় ব্যবহৃত— মূর্তি বা প্রতিমাকে প্রত্যহ যথার্থভাবেই স্নান করানো হয়ে থাকে। ফলে মোছাতেও হয়। শোয়ানো, বসানো প্রভৃতিরও নিয়ম হয়েছে। এসব কাজের সুবিধার জন্যে এ ধরনের মূর্তি বা প্রতিমাসমূহকে পিতল, ব্রোঞ্জ, রৌপ্য প্রভৃতি ধাতব পদার্থ অথবা পাথর দিয়ে আকারে ক্ষুদ্র এবং ওজনে হালকা করে নির্মাণ করা হয়ে থাকে।

লক্ষ্মী, নারায়ণ, গণেশ, শালগ্রাম শিলা, শিবলিঙ্গ[১] প্রভৃতি এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ওজনে হালকা এবং ক্ষুদ্রাকৃতি হওয়ার কারণে এগুলো যে পুতুল সদৃশ হয় বলেই যে কেউ এসবকে 'পুতুল' এবং এ-সবের পূজকদের "পৌত্তলিক" বলে অভিহিত করেন সেকথা অনুমান করা মোটেও কঠিন নয়।

পুতুল ও প্রকৃতি

অবোধ শিশুরা পুতুল নিয়ে খেলা করে। পুতুল শিশুদের অন্যতম খেলার সামগ্রী এবং খেলনা।

নর বা নারীর আকৃতি বিশিষ্ট পুতুল এবং অন্যান্য খেলনার মধ্যে কি পার্থক্য শিশুরা তা জানে না, তারা ওগুলো সংগ্রহও করে না। অবোধ শিশুদের জ্ঞানবান অভিভাবকেরাই নিজেদের কাজের সুবিধার জন্য নিজ নিজ শিশু বা শিশুদের অন্য-মনস্ক করা বা ভুলিয়ে রাখার প্রয়োজনে তাদের হাতে পুতুল তুলে দেয়।

---

১. সাধারণভাবে প্রত্যহ যেসব শিবলিঙ্গ পূজিত হয়ে থাকে যোনি-পীঠসহ সেগুলোর আকার দেড় থেকে দুইঞ্চির উর্ধ্বে হয় না।

প্রত্যহ মাটি দিয়ে নির্মিত শিবলিঙ্গের পূজাই বিশেষভাবে ফল-দায়ক বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। তবে এ আকারের পাথরনির্মিত শিবলিঙ্গের পূজাও প্রচলিত রয়েছে।

এ ক্ষেত্রে সাধারণত যোনি-পীটটিকে রৌপ্য বা ব্রঞ্জ দ্বারা পৃথকভাবে নির্মাণ করা হয়। পূজার সময়ে পাথরনির্মিত লিঙ্গমূর্তিটিকে ওর মধ্যে স্থাপন করা হয়।

কোনও কোনও শিব-ভক্ত রাজা, জমিদার বা বিত্তশালী লোক নিজ নিজ বাড়ির শিবমন্দির বা প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান যেসব শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন বা এখনও করেন সেসব শিবলিঙ্গ এবং যোনিপীঠ উভয়ই প্রস্তর নির্মিত এবং আকারে বৃহৎ হতে দেখা যায়। আমাদের আশেপাশের শিবমন্দিরেও এ ধরনের বৃহৎ আকারের শিবলিঙ্গ দেখতে পাওয়া যাবে।

www.pathagar.com

শৈশবে এমন একটা সময় আসে যখন শিশুরা পুতুল খেলায় মেতে ওঠে। বহু চেষ্টা করেও তাদের এ খেলা থেকে নিবৃত্ত করা যায় না। তারা পুতুলকে সাজায়, খাদ্য-পানীয় প্রভৃতি দিয়ে আপ্যায়িত করে, বিবাহ দেয়, পুতুলকে নিজেদের একান্ত আপনজন এবং খেলার অবিচ্ছেদ্য সাথীতে পরিণত করে।

পৃথিবীর সবশিশুই এটা করে। সুতরাং পুতুল খেলা যে শিশুদের প্রকৃতিগত এটা অনায়াসে বুঝতে পারা যাচ্ছে।

আবার এমন একটা সময় আসে যখন কারো প্ররোচনা বা নিষেধাজ্ঞার প্রয়োজন হয় না, আপনাআপনি তাদের এ পুতুল খেলার মত্ততা থেমে যায়। তারা নিজেরাই এ খেলা বর্জন করে।

অতএব এ বর্জন করাটাও যে তাদের প্রকৃতিগত সেকথাও অনায়াসে বুঝতে পারা যাচ্ছে। আর শৈশবের একটা নির্দিষ্ট সময়ই যে এ পুতুল খেলা শিশুদের প্রকৃতিগত থাকে এ থেকে সেকথাও সুস্পষ্টরূপেই বুঝতে পারা যাচ্ছে।

এইতো গেল ব্যক্তি-শিশুদের কথা। এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, সুদূর অতীতের কোনও এক সময়ে মানবজাতিকেও শৈশবকাল অতিক্রম করতে হয়েছে।

শৈশবকালের কোনও এক পর্যায়ে মানবজাতিও যে ব্যক্তি-শিশুদের মতো প্রকৃতিগত কারণে পুতুলপূজা করেছে প্রাচীনকালের বহু নিদর্শন এবং প্রত্ন-তাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক ও পুরাতাত্ত্বিক গবেষণায় তা বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

আবার ব্যক্তি-শিশুদের মতোই কালপরিক্রমায় নির্দিষ্ট পর্যায়ে উপনীত হওয়ার পর তারাও যে নিজে থেকেই পুতুলপূজা পরিহার করেছে তেমন প্রমাণেরও অভাব নেই।

বর্তমানে সভ্যতার আলোকদৃপ্ত যুগে বসবাস করেও মন-মানসের দিক দিয়ে নানা কারণে আজও যারা অন্তত এদিক দিয়ে শৈশব অতিক্রম করতে পারেনি অতীতের জের হিসেবে এখনো যে তাদের মধ্যে পুতুলপূজা প্রচলিত রয়েছে, আমরা স্বচক্ষেই তা দেখতে পাচ্ছি। এ থেকেও জাতি হিসেবে শিশু-মানবদের মধ্যে পুতুলপূজা প্রচলিত থাকার প্রমাণ সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে। এখানে পুতুল বলতে যে মূর্তি এবং প্রতিমাকেও বোঝাচ্ছে সেকথা বলাই বাহুল্য।

www.pathagar.com

অদ্ভুত সাদৃশ্য

অবোধ শিশুদের বুদ্ধিমান অভিভাবকরাই যে নিজেদের কাজের সুবিধার জন্য অর্থাৎ নিজেদের স্বার্থে নিজ নিজ শিশু বা শিশুদের অন্যমনস্ক করা বা খেলা দিয়ে ভুলিয়ে রাখার অভিপ্রায়ে তাদের হাতে শিশুমন আকর্ষণকারী পুতুল বা খেলনা তুলে দেয় ইতোপূর্বে সেকথা বলা হয়েছে। এ সম্পর্কে আমাদের প্রায় সকলেরই বাস্তব এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও রয়েছে।

আশ্চার্যের বিষয় : সুদূর অতীতে পুতুলপূজা প্রবর্তিত হওয়ার কারণ ও তথ্যপ্রমাণাদি নিয়ে পর্যালোচনা করলেও আমরা দেখতে পাই যে, সে-সময়েও অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান একটি শ্রেণী নিজেদের স্বার্থে তদানিন্তন কালের কম বুদ্ধিমান ও সহজ সরল শিশু-মানবদের অন্যমনস্ক করা বা ভুলিয়ে রাখার অভিপ্রায়ই এ পুতুল বা মূর্তিপূজার উদ্ভব ঘটিয়েছিল।

সেই সুদূর অতীতের শিশু-মানবরা এবং তদানিন্তন কালের তথ্য প্রমাণাদির কথা ছেড়ে আধুনিককালে ক্ষয়িষ্ণু এবং দ্রুত অপসৃয়মান অবস্থায় পৃথিবীর যে দু'চারটি দেশের কোনও কোনও স্থানে আজও প্রাচীন ঐতিহ্য, পুরুষানুক্রমে সংস্কার, মহাজন নির্দেশনা প্রভৃতি নানা অজুহাতে পুতুলপূজা টিকিয়ে রাখা হয়েছে আমরা যদি সেদিকে লক্ষ্য করি তাহলে এর পশ্চাতেও সেই একই কারণ আমরা দেখতে পাবো।

অবোধ শিশুদের পুতুলখেলা এবং বুদ্ধিমান বড়দের পুতুলপূজার মধ্যে আরও একটি আশ্চার্যজনক সাদৃশ্য রয়েছে। সেই সাদৃশ্যটি হলো :

অবোধ শিশুরা পুতুলদের প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে এবং আদর-যত্ন করে। সুন্দরভাবে সাজানো, স্নান, বস্ত্র পরিধান, বিবাহ, আহার্য প্রদান, আচমন, শয়ন, ঘুম পাড়ানো প্রভৃতি কাজগুলোও সাধ্যানুযায়ী দক্ষতা ও নিপূণতার সাথে তাঁরা সমাধা করে থাকে।

পক্ষান্তরে পুতুল প্রতিমাদির পূজকেরাও পুতুল প্রতিমাদের প্রাণ দিয়ে ভালোবাসেন, ভক্তি শ্রদ্ধা করেন এবং পূজার মাধ্যমে তাদের পাদ্য (পা ধোয়ার জল) অর্ঘ্য, (প্রাথমিক উপঢৌকন), স্নানীয় (স্নানের জল), আচ্ছাদন (পরিধেয় বস্ত্র), ভোগ (আহার্য), আচমনীয় (মুখ ধোয়ার জল), তাম্বুল (পান-সুপারী)

www.pathagar.com

প্রভৃতি দ্বারা আপ্যায়িত করেন। রাত্রিতে 'ঠাকুর বৈকালী' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে লঘু আহার্য ও আরতি প্রদানের পরে শয্যায় শোয়ানোর ব্যবস্থাও করে থাকেন।[১] কাজেই এ উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য যে রয়েছে সেকথা অনায়াসে বুঝতে পারা যাচ্ছে।

পার্থক্য শুধু এটুকুই যে, ভিন্ন ভিন্ন দেশের শিশুরা পুতুলদের লক্ষ্য করে তাদের নিজ ভাষায় আদর আপ্যায়নের কথাগুলো বলে। আর পূজকেরা মাতৃভাষার পরিবর্তে নিজ নিজ ধর্মীয় গ্রন্থের ভাষায় কথাগুলো বলেন। মোটকথা উভয়ের কথার অর্থ এবং ভাব অভিন্ন; পার্থক্য শুধু ভাষার।

অবশ্য অন্য একটি পার্থক্যও রয়েছে। তাহলো : পূজার এক পর্যায়ে পূজকেরা পুতুল-প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন, শিশুরা তা করে না। তবে সেখানেও সাদৃশ্য রয়েছে। শিশুদের খেলার পুতুল অচল ও প্রাণস্পন্দনহীন হলেও তারা ও-গুলোকে সজীব মনে করেই আদর যত্ন করে, পূজার পুতুল প্রতিমারা প্রাণপ্রতিষ্ঠার মন্ত্রপাঠের পরেও অচল এবং প্রাণস্পন্দনহীনই থাকে। সেক্ষেত্রেও শিশুদের মতো পূজকেরা ঐ অচল ও প্রাণস্পন্দনহীন পুতুল-প্রতিমাদের সজীব মনে করেন এবং ভক্তি শ্রদ্ধার সাথে ভোগ নৈবেদ্যাদি দিয়ে পূজার্চনার কাজ চালিয়ে যান। অতএব এই 'মনে করার' ব্যাপারে উভয়ের মধ্যে যে পরিপূর্ণ সাদৃশ্য বিদ্যমান সেকথা বুঝতে অনেক বিদ্যা-বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না।

তবে এসব দিক দিয়ে যত সাদৃশ্যই থাক, অন্তত একটি দিক দিয়ে সাদৃশ্যের পরিবর্তে অসাদৃশ্য বা বৈপরীত্যই আমরা দেখতে পাই। সে দিকটি হলো :

শিশুরা পুতুলদের প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে এবং যথাসাধ্য আদর আপ্যায়নও করে। কিন্তু তাদের কাছে কোনও প্রতিদান চায় না, প্রতিদানের আশাও করে না। অর্থাৎ তাদের এ ভালোবাসা একান্তরূপে নিঃস্বার্থ।

পক্ষান্তরে পুতুল-প্রতিমার পূজকদের প্রেম ভালোবাসা যতটুকুই থাক এবং প্রদত্ত ভোগ-নৈবেদ্যের মান পরিমাণ যাই হোক তাঁরা তার বিনিময়ে বা প্রতিদানে ইহ-পরকালের যা কিছু প্রয়োজন তার চেয়েও অনেক বেশি পাওয়ার আশা করেন।

এ আশা করার যুক্তি হিসেবে তাঁরা বলেন যে, "তাঁরা মৃন্ময় মূর্তিতে চিন্ময় দেবতা"র পূজা করেন। আর দেবতারা খুশি হলে তাঁদের অদেয় কিছুই থাকতে

---

১. পুরোহিতদর্পণ, হিন্দুসর্বস্ব, নিত্যকর্মপদ্ধতি প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। (পূজার সময়ে উপস্থিত থাকলে এসব কাজ স্বচক্ষে দেখা যেতে পারে— লেখক)।

www.pathagar.com

রে না। এমনকি ভক্তের বাঞ্ছাপূরণের জন্য তাঁরা যে নিজেদের প্রিয়তমা স্ত্রীকেও তাদের হাতে সমর্পণ করেন ধর্মগ্রন্থে তারও ভুরি ভুরি প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। অতএব আসুন এবারে আমরা দেবদেবী তথা দেবতাদের পরিচয় লাভের চেষ্টা করি।

দেবদেবী ও দেবতা শব্দের তাৎপর্য

অভিধান মতে :

দেব : ১। দেবতা, সুর, ঈশ্বর, পরমাত্মা, (নাট্যোক্তিতে) রাজা, ব্রাহ্মণ, বিজিগীষু, দেবর, মেঘ, পারদ, সম্মান-সূচক উপাধি, ব্রাহ্মণের উপাধি। (বিং পুং)।

২। ইন্দ্রিয়, বিং ক্লী। ৩। পূজ্য, দিব্ + অচ্ কর্ত্তৃ বিণ।

দেবী : স্ত্রী দেবতা, (নাটক) রাজমহিষী, ব্রাহ্মণ জাতীয়, স্ত্রীলোকের উপাধি, মর্যাদাসূচক নামান্তর, পূজনীয় নারী। দুর্গা। দেব + ঈপ্। (বিঃ স্ত্রী)।

দেবতা : অমর, সূর, দেব। দেব + তল স্বার্থে + আপ্। (বিঃ স্ত্রী)।

ব্যাকরণের মতে দেব ও দেবতার সংজ্ঞা

"দেবো দানাদ বা দীপনাদ বা দ্যোতমদ বা দ্যুস্থানো ভবতীব।"

অর্থাৎ— যিনি দান করেন তিনি দেব, যিনি দীপ্ত বা দ্যোতিত হন তিনি দেবতা এবং যিনি দ্যুস্থানে থাকেন তিনি দেবতা।

বেদের দেবতা

প্রতিটি বেদ-মন্ত্রের শুরুতেই উক্ত মন্ত্রের দেবতা, রচয়িতা, কোন্ কাজে ব্যবহৃত হবে এবং কোন্ ছন্দে পাঠ করতে হবে সুস্পষ্ট ভাষায় সেকথা লিখা রয়েছে। কোনও কোনও দেবতার উদ্দেশ্যে বহুসংখ্যক মন্ত্রও রচিত হয়েছে। আবার কোনও কোনও দেবতার উদ্দেশ্যে মাত্র দুই বা তিনটি মন্ত্রও দেখতে পাওয়া যায়।

বিভিন্ন পুরাণের বর্ণনানুযায়ী ছোট বড় মিলে দেবতার মোট সংখ্যা তেত্রিশ কোটি। সাধারণভাবে গোটা হিন্দুসমাজ এ সংখ্যার প্রতিই বিশ্বাস পোষণ করেন। কিন্তু বেদ-পুরাণাদি কোনও ধর্মগ্রন্থেই এ তেত্রিশ কোটি দেবতার নাম

www.pathagar.com

এবং পরিচয় লিপিবদ্ধ করা হয়নি। ওসব গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্নভাবে যেসব দে
নাম ও পরিচয় রয়েছে তাদের মিলিত রয়েছে তাদের মিলিত সংখ্যা তিন
নয়। এদের মাঝে প্রসিদ্ধ-অপ্রসিদ্ধ, সম্পূজিত-অপূজিত, প্রভাব-
অপ্রভাবশালী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ধরনের দেবদেবী রয়েছে।

ঋগ্বেদ-সংহিতার একাধিক স্থানে দেবতাদের সংখ্যা বলা হয়েছে। দুটি ঋক অনুযায়ী তাদের সংখ্যা ৩৩৩৯ (৩/৯/৯ ও ১০/৫২/৬) কিন্তু উক্ত বেদের সূক্তগুলোতে যাদের দেবতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে তাঁদের সকলের সংখ্যা যোগ করলেও ৩৩৩৯ হয় না। খুব সম্ভব স্বর্গবাসী দেবতাদেরও এর মধ্যে ধরা হয়েছে।

ঋগ্বেদের ৮/২৮/১ ঋকে ৩৩টি দেবতার উল্লেখ থাকতে দেখা যায়। কালক্রমে এ তেত্রিশই 'তেত্রিশ কোটি'তে পরিণত হয়েছে কিনা সেকথা ভেবে দেখা প্রয়োজন। নিরুক্তকার যাস্কের মতে দেবতার সংখ্যা মাত্র তিনটি। তাঁরা হলেন— পৃথিবী লোকের— অগ্নি, অন্তরিক্ষ লোকের— বায়ু বা ইন্দ্র এবং দ্যুলোকের— সূর্য।

বলাবাহুল্য, যাস্কের এ মতকে সমর্থন করা যেতে পারে না। কারণ অগ্নি, বায়ু বা ইন্দ্র এবং সূর্য ছাড়াও বরুণ, পুষা, যম, বৃহস্পতি প্রভৃতি বেশ কিছুসংখ্যক প্রসিদ্ধ দেবতা রয়েছে।

পাঠকবর্গের ধৈর্যচ্যুতির আশঙ্কায়— এ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনায় যেতে চাই না। অতএব মোটামুটি এটুকু বলেই ক্ষান্ত হচ্ছি যে, বেদের বিভিন্ন ঋকে প্রস্তর খণ্ড, ধনুক, এমনকি মণ্ডুককেও (ভেক) দেবতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

বিশেষ শক্তির আধার এবং যজ্ঞের মাধ্যমে যাদের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করা হয় তাদের দেবতা বলা হয়েছে। এর কারণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, ঋগ্বেদের প্রথম দিকের সূক্তগুলো রচিত হয়েছে আর্ত এবং অর্থার্থী— মনোভাব নিয়ে। অর্থাৎ— শত্রু, রোগব্যাধি ও বিপদাপদ থেকে পরিত্রাণ লাভ এবং বৈষয়িক সমৃদ্ধির কামনাই ছিল এসব ঋক রচনার উদ্দেশ্য। অতএব যেখানে শক্তির প্রকাশ তার স্তুতিবাদ এবং তার কাছে প্রার্থনা করাই সে স্বাভাবিক ছিল সেকথা অনায়াসে ধরে নেয়া যেতে পারে।

পাঠকবর্গের ধৈর্যচ্যুতির আশঙ্কার কথা পূর্বে বলা হয়েছে। কিন্তু অসুবিধা হলো— 'মূর্তিপূজার গোড়ার কথা' বলতে গিয়ে দেবদেবী বা দেবতাদের মোটামুটি পরিচয় তুলে ধরা না হলে গোড়ায় উপনীত হওয়া কোনওক্রমেই সম্ভব হবে না। অতএব পাঠকবর্গের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে দেবতাদের মোটামুটি পরিচয় নিম্নে খুবই সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হচ্ছে।

www.pathagar.com

তবে এ জন্য আমার নিজের অতি নগণ্য অভিজ্ঞতার প্রতি নির্ভর না করে ঋগ্বেদ সংহিতার প্রথম খণ্ডের বঙ্গানুবাদে 'ঋগ্বেদের দেবতা' শীর্ষক নিবন্ধটি হুবহু নিম্নে উদ্ধৃত করছি।

"..... ঋগ্বেদের সূক্তে বর্ণিত এ দেবতাদের প্রকৃত দেবতা বলে স্বীকৃতি দেয়া যায় : অগ্নি, মিত্র, বরুণ, মরুৎগণ, বৃহস্পতি, পুষণ, আদিত্যগণ, ব্রহ্মণস্পতি, দ্যৌ, রাত্রি, রুদ্র, বায়ু, সবিতা, অদিতি, যম, অশ্বিদ্বয়, ভগ, তৃষ্টা, সোম, বিষ্ণু, ঊষা, সূর্য, পৃথিবী, অপগণ, পর্জন্য, সরস্বতী (নদী)। এ তালিকায় বিশ্বকর্মা ও প্রজাপতি স্থাপন করা হলো না। কারণ তাঁদের ওপর রচিত সূক্তগুলো দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনায় পূর্ণ।

অগ্নির নানা রূপ আছে যেমন, ইদ্ধ্য, সামিদ্ (যুক্ত অগ্নি) তনুনপাৎ (গর্ভস্থ অগ্নি) অপাংনপাৎ (জলজ অগ্নি), মাতরিশ্বন (অন্তরিক্ষের অগ্নিবিদ্যুৎ) জাতবেদ্য, নরাশংস, বৈশ্বানর ইত্যাদি।

এদের আলাদা উল্লেখ করার প্রয়োজন দেখি না। সোম অর্থে সোমলতা বোঝায়। সমগ্র নবম মণ্ডলের সবকটি সূক্ত এ সোমলতার উদ্দেশ্যে রচিত। দ্যুস্থানের দেবতা হিসেবেও সোমের উল্লেখ আছে (৭/১০৪ এবং ১০/৮৫/১৯)। কিন্তু তাঁর বিশেষ প্রাধান্য নেই। তাই সোম বলতে সোমলতাই ধরবো। সূর্য, সবিতা ও বিষ্ণু মনে হয় যেন একই দেবতা। সূর্যই মূল দেবতা।

৫/৮১/৫ ঋকে পাই— সবিতা ঊষার পশ্চাৎ উদিত হয়, সূর্যরশ্মি দ্বারা সংযত হয় এবং গতি দ্বারা পুষা হয়।

পুষাকে সূর্যের রথ-পরিচালকরূপে কল্পনা করা হয়েছে (৬/৫৬/৩)। বিষ্ণু তিন পদক্ষেপে আকাশ পরিক্রমণ করেছে কল্পনা করা হয়েছে (৬/৪৯/১৩)। মনে হয়— বিষ্ণু সূর্যেরই আর এক নাম। এদের সম্বন্ধ মোটের ওপর খুব ঘনিষ্ঠ।

পূর্বেই বলা হয়েছে, দেবতাদের অবস্থিতি স্থান অনুসারে তিন শ্রেণীতে ভাগ করার রীতি আছে। তবে মনে হয় ওপরে উল্লিখিত এমন কয়েকটি দেবতা আছে যাঁরা কোন্ শ্রেণীতে পড়বে ঠিক করা শক্ত হয়। মূল দেবতাদের অবস্থিতির ভিত্তিতে এভাবে ভাগ করা যেতে পারে।

পৃথিবীর স্থান : অগ্নি, পৃথিবী, অপ, সোম। অন্তরিক্ষ : ইন্দ্র, রুদ্র, পর্জন্য। দ্যুলোক : সূর্য, সবিতা, বিষ্ণু, মিত্র, বরুণ, দ্যু, পূষা, অশ্বি যুগল, ঊষা, রাত্রি, যম, বৃহস্পতি।

আমরা এখন বৈদিক দেবতাদের সম্বন্ধে একটি করে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেব। তাদের আলোচনা কি ক্রম অনুসারে হবে তা ঠিক করা শক্ত হয়ে পড়ে। একটা

www.pathagar.com

রীতি হতে পারে, যে দেবতার নামে যতবেশি সূক্ত আছে তাকে আগে স্থাপন করা।

এ হিসেবে ইন্দ্র সবার প্রথম আসে : তারপর আসে অগ্নি, তারপর আসে সোমলতা।

এদিকে পৃথিবীকে একা নিয়ে মাত্র একটি সূক্ত আছে। সুতরাং এ নীতি প্রয়োগ করে— দেবতাদের ক্রম ঠিক করা যায় না।

আর একটি নীতি হতে পারে— দেবতার গুরুত্ব অনুসারে তাদের ক্রম নির্দিষ্ট করা। সে হিসেবে ধরলে সম্ভবত বরুণ সবার আগে আসে। কিন্তু এ ক্রম ঠিক করতে ব্যক্তিগত মূল্যায়নই প্রধান অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায়। তা বিভিন্ন মানুষের মূল্যবোধ অনুসারে বিভিন্ন হয়ে দাঁড়াবে। কাজেই তাকে গ্রহণ করা যায় না।

এ ক্ষেত্রে দেবতাদের যে শ্রেণীবিভাগ ঐতিহ্য অনুসারে গৃহীত হয়েছে সেই শ্রেণী অনুসারে দেবতাদের সাজানো যেতে পারে। অর্থাৎ— প্রথমে পৃথিবী স্থানের এবং শেষে দ্যুস্থানের দেবতারা আসবে।

প্রতি শ্রেণীর মধ্যে কে আগে কে পরে পড়লো তাতে কিছু আসে যায় না। তবে একই ধরনের দেবতাকে পাশাপাশি স্থাপন করা যেতে পারে, যেমন— সূর্য, সবিতা ও বিষ্ণু বা ঊষা ও রাত্রি। সেই রীতিই এখানে প্রয়োগ করা হবে।

পৃথিবী স্থানের দেবতা

১. অগ্নি : অগ্নির উদ্দেশ্যে দুইশত সূক্ত রচিত হয়েছে। অগ্নি যজ্ঞের অবলম্বন। সেজন্য অগ্নিকে ঋত্বিক, পুরোহিত ও হোতা বলা হয়েছে। অগ্নিই দেবতাদের যজ্ঞের আনয়ন করে। তার রথে করে তিনি দেবতাদের আনয়ন করে। অগ্নি প্রতিদিন দুটি অরণি কাঠের সংঘর্ষে প্রজ্জ্বলিত হয়। তারাই তার পিতা-মাতা। জন্মের পর সে তাদের খেয়ে ফেলে। ঘৃত এবং কাষ্ঠ তার আহার্য। তরল হব্য তার পানীয়। অগ্নির নানা রূপ। সে কখনও জাতবেদ্য, কখনও রক্ষোথ, কখনও দ্রবিনোদা, কখনও তনুনপাৎ, কখনও নরাশংস, কখনও মাতরিশ্বন।

২. পৃথিবী : দ্যৌ-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে পৃথিবী বন্দনার ছয়টি সূক্ত আছে। পৃথিবী 'অবম' অর্থাৎ সর্বনিম্ন লোক এবং দ্যৌ পরম বা সর্বোচ্চ লোক। তারা দু'জনে বিশ্বের পিতা-মাতারূপে কল্পিত। এককভাবে পৃথিবীর উদ্দেশ্যে রচিত

www.pathagar.com

একটি সূক্ত আছে (৫/৮৪)। সেখানে পৃথিবীকে পর্বত সকলের ধারকরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। যখন বৃষ্টি হয় তখন গাছগুলো শুয়ে পড়ে না— কারণ পৃথিবী তাদের দৃঢ়ভাবে ধরে রাখে।

৩. অপ : জল অন্তরিক্ষে উৎপন্ন হয় এবং খাদে প্রবাহিত হয়। তা সমুদ্রের দিকে গমন করে। জল বৃষ্টি পান করে। তা অন্ন সঞ্চয় করে দেয়। জল মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে। জল স্নেহময়ী জননীর মত। জল মানুষকে শুদ্ধ করে। তাই আমরা তাকে মাথায় ঢালি। জল মানুষকে দুস্কৃতি থেকে মুক্তি দেয়। এ ধরনের ধারণা থেকেই বোধহয় পরবর্তীকালে নদীতে স্নানের রীতি হিন্দুসমাজে প্রচলিত হয়েছিল। জল সম্পর্কে চারটি সূক্ত আছে।

৪. সোম : এক শ্রেণীর লতা ছিল। পার্বত্য অঞ্চলে সে লতাগুলো জন্মাতো। তার পাতা পাথরে নিষ্পেষিত হয়ে যে রস বের হতো তাকেই সোম বলা হয়।

বিভিন্ন সূক্তে সোম কিভাবে উৎপাদিত হতো তার বর্ণনা পাওয়া যায়। প্রথমে তা জল দিয়ে ধোয়া হতো। তারপর পাথর দিয়ে নিষ্পিষ্ট হতো। তার রঙ ছিল হরিতবর্ণ। তারপর তা যজ্ঞে ব্যবহারের জন্য কলসের মধ্যে স্থাপিত হতো। এরপর দুধের সঙ্গে মেশান হতো।

অগ্নিতে যেমন ঘৃত আহুতি দেয়া হতো তেমন সোমেরও আহুতি দেয়া হতো। বর্ণনা আছে— সোম পান করে ইন্দ্রের শক্তি বর্ধিত হতো। সেকালের মানুষও সোম পান করে উৎফুল্ল হতো। তা নিশ্চয় তাদের প্রিয় পানীয় ছিল, যেমন ঘৃত তাদের প্রিয় খাদ্য ছিল। তাই দেবতাদের নিকটও তা আহুতি আকারে দেয়া হতো।

মনে হয় সোমরস অত্যন্ত প্রিয় পানীয় ছিল এবং সেই কারণে তা একজন বিশিষ্ট দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সে জন্য দেখি তার উদ্দেশ্যে ১২০টি সূক্ত রচিত হয়েছে। সমগ্র নবম মণ্ডলে যতগুলো সূক্ত আছে— সবই পবমান সোমের উদ্দেশ্যে রচিত। 'পবমান' অর্থ ক্ষরণশীল। অর্থাৎ সোমরসই এখানে দেবতা।

দুর্ভাগ্যক্রমে এ সোমলতার কোনও সন্ধান এখন পাওয়া যায় না। সরস্বতী নদীর মত বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কেবল তার স্মৃতি এবং অশেষ গুণের কথা ঋগ্বেদের সূক্তগুলোতে রক্ষিত হয়ে আছে।

www.pathagar.com

অন্তরিক্ষের স্থানের দেবতা

৫. ইন্দ্র : একদিক থেকে বিবেচনা করলে ইন্দ্র ঋগ্বেদের মধ্যে প্রধান। ঋগ্বেদের সূক্তগুলোর এক চতুর্থাংশ তার প্রশস্তিতে নিবেদিত।

দুর্দমনীয় যোদ্ধারূপেই তিনি পরিকল্পিত। অগ্নি এবং পূষা তার ভ্রাতা। মরুৎগণ তার সহায়। বজ্র তার অস্ত্র। তৃষ্টা তার জন্য বজ্র নির্মাণ করেছিলেন। কোথাও তা লৌহ নির্মিত বলে উল্লেখ হয়েছে, কোথাও প্রস্তর নির্মিত বলে উল্লেখ হয়েছে। দুটি হরিতবর্ণ অশ্বদ্বারা পরিচালিত সোনার রথে সে আরোহণ করে। সে সোমরস পান করতে ভালোবাসে।

তাকে প্রধানত তিনটি ভূমিকা দেয়া হয়েছে। প্রথমত, সে বৃত্রকে সংহার করে মেঘ থেকে বারিবর্ষণের পথ উন্মুক্ত করে দেয়। দ্বিতীয়ত, সে দেবতায় অবিশ্বাসী মানুষদের দুর্গ সমন্বিত আবাস স্থানগুলো ধ্বংস করে তাদের বিনাশ করে। তৃতীয়ত, সে বিষ্ণুকে সংরক্ষিত করার জন্য অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছে।

বৃত্রকে কোথাও অহিও বলা হয়েছে। যে সব বর্ণনা পাই তা থেকে মনে হয় মেঘের মধ্যে বারিকে অবরুদ্ধ করে রাখে যে শক্তি তাকেই বৃত্ররূপে কল্পনা করা হয়েছে। বৃত্র বারিধারা পুষ্ট হয়ে নদীগুলোকে প্রবাহিত হতে দেয় না। তাই সে দানবরূপে কল্পিত। তার ক্রোধ থেকে উৎপন্ন আর একটি দানব ছিল। তার নাম শুষ্ণ। ইন্দ্র বজ্র নিক্ষেপ করে উভয়কেই বধ করেছিল। ফলে মেঘের মধ্যে আবদ্ধ সঞ্চিত বারিধারা মুক্ত ও ভূপাতিত হয়ে নদীগুলোকে পুষ্ট করেছিল।

তার দ্বিতীয় ভূমিকা আরও গুরুত্বপূর্ণ এবং সম্ভবত তার একটি ঐতিহাসিক তাৎপর্যও আছে। সে এ ভূমিকায় বীর যোদ্ধারূপে পরিকল্পিত। সে আর্য জাতির রক্ষক। তার জন্য সে দস্যুদের বধ করতেও কুণ্ঠিত নয় (৩/৩৪/৯)। এ দস্যুদের দাসও বলা হয় এবং আর্য জাতি থেকে পৃথক করা হয় (১০/১০২/৩)। সে শত্রুদের পরাজিত করার জন্য বল দ্বারা নগরের পর নগর ধ্বংস করে। (১/৫৬/৭)।

www.pathagar.com

এসব উক্তি থেকে মনে হয়— আর্য জাতির ভারতে প্রবেশের পর স্থানীয় অধিবাসীদের সহিত সংঘর্ষ হয়। তাদেরই দাস বা দস্যু বলে বর্ণনা করা হয়েছে। হরাল্লা সংস্কৃতি আবিষ্কারের পর আর কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই যে, এদের আর্যদের আগমনের আগে যে-সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল তা তাদের থেকে উন্নতমানের নগরভিত্তিক সংস্কৃতি। সুতরাং তাদের জয় করতে হলে নগর ধ্বংস করা প্রয়োজন। সম্ভবত আর্যদের কোনও পরাক্রান্ত নেতা স্থানীয় অধিবাসীদের বিরুদ্ধে অভিযানে আর্যদের যুদ্ধে নেতৃত্ব গ্রহণ করে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছিল। তারই আদর্শে যেন ইন্দ্র পরিকল্পিত হয়েছে। তাই তার আরেক নাম পুরন্দর। এও বলা হয়েছে সে বিপক্ষ নগরগুলো ভেদ করেছে এবং শত্রুর অস্ত্র নত করেছে (১/১৭৪/৮)।

তার তৃতীয় ভূমিকা হলো সে বিশ্ব স্থিতির জন্য কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছে। সে পৃথিবীকে দৃঢ় করেছে। পর্বতসমূহ সংহত করেছে। সে অন্তরিক্ষ নির্মাণ এবং দ্যুলোক স্তম্ভিত করেছে।

৬. রুদ্র : রুদ্রকে উদ্দেশ্য করে মাত্র তিনটি সূক্ত আছে। কিন্তু তার তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী। ঋগ্বেদে শিবের উল্লেখ নেই। কিন্তু শিব পৌরাণিক যুগে অন্যতম শীর্ষস্থানীয় দেবতারূপে পরিগণিত হয়। রুদ্রই সম্ভবত পরবর্তীকালে শিবে পরিণত হয়েছে।

রুদ্রের সাথে মরুৎগণের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। রুদ্র তাদের পিতা এবং পৃষ্ণি অর্থাৎ ঝড়ের মেঘ তাদের মাতা। বেদে রুদ্রের যে চিত্র আঁকা হয়েছে তাতে সে ক্রোধপরায়ণ এবং ধ্বংস-প্রবণরূপে পরিকল্পিত। এখানে ভক্তি প্রেরণ যেন ভয়। তাকে হব্য দিয়ে খুশি করার চেষ্টা করা হয় যাতে সে মানুষ, পশু ইত্যাদি হিংসা থেকে বিরত থাকে (১/১১৪/৮)। সে উগ্র স্বভাব (২/৩৩/৯) এবং ক্রোধ-পরায়ণ (২/৩৩/৫)। তবে সে সর্বশ্রেষ্ঠ ভিষকরূপে খ্যাত (২/৩৩/৪) সুতরাং তার একটি কল্যাণের দিকও আছে।

৭. পর্জন্য : পর্জন্যের উদ্দেশ্যে মাত্র তিনটি সূক্ত রচিত হয়েছে। সে অন্তরিক্ষের পুত্ররূপে পরিকল্পিত (৭/১০২/১)। পর্জন্য মেঘ দিয়ে অন্তরিক্ষ ব্যাপ্ত করে। সে মেঘ থেকে বারি বর্ষণ করিয়ে থাকে। ফলে গবাদিপশু পুষ্টিলাভ করে। ওষধি সকল উজ্জীবিত হয়; নদী অপ্রতিহত বেগে প্রবাহিত হয়। এভাবে পর্জন্য পৃথিবীর সকল জীবের কল্যাণ সাধন করে (৫/৮৩)।

www.pathagar.com

দ্যুস্থানের দেবতা

৮. সূর্য : বেগবান অশ্বরথে যুক্ত করে আকাশ পথে গমন করে (১৭/৩৭/৩)। আবার বলা হয়েছে— সে হরিৎ নামে সাতটি অশ্বীবাহিত রথে চলে। জ্যোতি তার কেশ (১/৫০/৮)। সূর্য আকাশে ঊষাকে অনুসরণ করে। সূর্য সকল স্থাবর ও জঙ্গম প্রাণীর আত্মাস্বরূপ (১/১১৫/১)। সূর্যের রোগ বিনাশক শক্তিরও উল্লেখ করা হয়েছে। সূর্য হৃদরোগ হতে মানুষকে মুক্ত করে এবং হরিমান রোগ সারিয়ে দেয় (১/৫০/১১-১২)। সম্ভবত পণ্ডরোগ বা ন্যাবারোগকে হরিমান রোগ বলা হতো কারণ তাকে হরিদ্রায় স্থাপন করার উল্লেখ আছে। বিশ্ব-ভুবন এবং প্রাণীবর্গ সূর্যের আশ্রিত (১০/৩৭/১)।

৯. সবিতা : সবিতা সূর্যের কিরণে কিরণযুক্ত। সে উজ্জ্বল কেশ বিশিষ্ট (১০/১৩৯/১)। সবিতা জ্ঞানী, সুমহান ও পূজনীয় (৫/৮১/১)। সবিতা পিশঙ্গ পরিচ্ছদ পরিধান করে। সে প্রতিদিন জগতকে নিজ নিজ কার্যে স্থাপন করে (৪/৫৩/৩)। মনে হয় সবিতার ধীশক্তির জন্য সে বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিল। তার উদ্দেশ্যে প্রসিদ্ধ গায়ত্রী মন্ত্রটি রচিত হয়েছে। মন্ত্রটি তৃতীয় মণ্ডলের ৬২তম সূক্তের দশম ঋকে পাওয়া যায়। মনে হয় সূর্যের সঙ্গে সবিতার সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ। দশম মণ্ডলের ১৫৮ সূক্তে দেখা যায় সূর্যকে কখনও সূর্য বলা হয়েছে, কখনও সবিতা বলে সম্বোধন করা হয়েছে। সম্ভবত তারা ভিন্ন নামে পরিচিত অভিন্ন দেবতা।

১০. বিষ্ণু : বিষ্ণু তিন পদক্ষেপে সমস্ত ভুবনে অবস্থিতি করে (১/১৫৪/২)। মানুষ বিষ্ণুর দুই পদক্ষেপ দেখতে পায় কিন্তু তার তৃতীয় পদক্ষেপ ধারণা করতে পারে না। ওপরে যেসব পাখি ওড়ে তারাও তা ধারণা করতে পারে না (১/১৫৫/৫)। সম্ভবত এ তিন পদক্ষেপ সূর্যেরই আকাশে তিন স্থানে অবস্থিতির ইঙ্গিত করে।

প্রাতঃকালে সূর্য পূর্ব দিগন্তে, সন্ধ্যায় পশ্চিম দিগন্তে এবং মধ্যাহ্নে আকাশের মধ্যস্থলে। মধ্য গগণে যখন সূর্য বিরাজ করে তখন তা মানুষের বা পাখির নাগালের বাইরে চলে যায়। এ সূক্তের ষষ্ঠ ঋকে একটি তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি আছে। বিষ্ণু বছরের চারটি নব্বই দিবসের সমষ্টি নিয়ে বছরের চক্র। কাজেই বিষ্ণু

www.pathagar.com

ঋতুর নিয়ামক দেবতা। এদিক থেকে দেখলেও এও সূর্যেরই সমস্থানীয় হয়ে দাঁড়ায়।

১১. মিত্র : মিত্র পৃথিবী ও দ্যুলোককে ধারণ করে আছে। সে অনিমেষ নেত্রে সকলের দিকে চেয়ে আছে (৬/৫৯/১১) সে নিজ মহিমায় দ্যুলোক অভিভূত করেছে (৩/৫৯/৭)। প্রত্যুষে সূর্যোদয় হলে মিত্র লৌহকীলক সমন্বিত সুবর্ণ নির্মিত রথে আরোহণ করে (৫/৬২/৮)। দ্যুতিমান সূর্য, মিত্র ও বরুণের চক্ষু স্বরূপ (৭/৬৩/১)। কেবল মিত্রকে অবলম্বন করে মাত্র কয়েকটি সূক্ত আছে। মিত্র ও বরুণকে একত্র করে অনেকগুলো সূক্ত আছে। সেগুলো এমনভাবে রচিত যে কোনটি মিত্রের বিশেষ গুণের পরিচায়ক তা বোঝা যায় না। তবে এটা বোঝা যায় সূর্যোদয়ের সঙ্গে তার বিশেষ সংযোগ আছে। সে কি সূর্যের আনুষঙ্গিক দেবতা?

১২. পূষা : পূষা দীপ্তিসম্পন্ন (৬/৫৩/৩)। ছাগ তার বাহন (৬/৫৫/৪)। এ হচ্ছে রথিশ্রেষ্ঠ। সূর্যের হিরন্ময় রথচক্র নিয়ত পরিচালিত করছে (৬/৫৬/৩)। আবার বলা হয়েছে এ সূর্যের দৌত্য কার্য সম্পাদন করে। এমনকি সূর্যরূপে প্রাণীদের প্রকাশিত করে (৬/৫৮/২)। ঊষা তার ভগিনী। রাত্রি তার পত্নী (৬/৫৫/৫)।

এসব বর্ণনা থেকে পূষা সম্বন্ধে কোনও সুস্পষ্ট ধারণা গড়ে ওঠে না। মোটামুটি মনে হয় সূর্যের সাথে তার নিবিড় ঘনিষ্ঠতা আছে। বোধহয় সূর্যের রথচালকরূপে তার ভূমিকাই সব থেকে গ্রহণযোগ্য। ১০/১৩২/৪ সূক্তে বলা হয়েছে পূষা সূর্য থেকে ভিন্ন।

১৩. বরুণ : বরুণ মহা দেবতারূপে কল্পিত। সে শোভন কর্মা। মানুষের জন্য অন্নের ব্যবস্থা করেছে। দ্যুলোক, ভূলোক ও সমস্ত জগতে দীপ্যমান (১/২৫/২০)।

বরুণ জগতের নায়ক। জল সৃষ্টি করেছে। বরুণের নির্দেশে নদী সকল প্রবাহিত হয় (২/২৮/৪)। সূর্যের পরিক্রমণের জন্য অন্তরিক্ষকে বিস্তারিত করেছে, অশ্বদের বল, ধেনুদেরকে দুগ্ধ এবং হৃদয়ে সংকল্প প্রদান করেছে।

বরুণ স্পষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন। তার সুমহতী প্রজ্ঞা (৫/৮৫/৬)। বরুণ সূর্যকে দীপ্তির জন্য নির্মাণ করেছে। সমুদ্রকে স্থাপন করেছে। সমস্ত সৎ পদার্থের রাজা। অপরাধ করলে বরুণ দয়া করে (৭/৮৭/৭)। বরুণ ভুবনসমূহের ধারক, সপ্ত ঈশ্বর (৮/৪১/৯)। বরুণ সমস্ত ভুবনের সম্রাট, আমরা তার ক্রোড়ে বর্তমান (২/৪২/২)।

ওপরে যে তথ্যগুলো স্থাপিত হয়েছে তা থেকে বরুণ সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট ধারণা করা যায়। ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে ঋগ্বেদের এক চতুর্থাংশ সূক্ত নিবেদিত।

www.pathagar.com

বরুণের উদ্দেশ্যে রচিত সূক্তের সংখ্যা খুবই কম। মিত্রের সঙ্গে সংযুক্ত আকারে অনেকগুলো সূক্ত পাওয়া যায়; কিন্তু তাদের মধ্যে বরুণের বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয়ে ওঠেনি। তাতে কিছু যায় আসে না। ওপরে বরুণের উদ্দেশ্যে রচিত সূক্তগুলো থেকে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে তা থেকেই তার চরিত্র সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট ধারণা করা যায়।

বরুণ জগতের নায়ক। তার নির্দেশেই নদীসকল প্রবাহিত হয়ে পৃথিবীকে শস্যমণ্ডিত করে। সুতরাং সে বিশ্বের রাজা। ধৃতব্রত। বিশ্বকে পরিচালিত করার কাজে তিনি নিযুক্ত। বিশ্বকে ক্রোড়ে ধারণ করে। প্রজ্ঞাবান। অন্যায় সহ্য করে না। কিন্তু অন্যায়কারীকে ক্ষমা করতে প্রস্তুত। সুতরাং অনেক মহৎ গুণের আকর। এদিক থেকে বিবেচনা করলে বরুণ সুনিশ্চিতভাবে বৈদিক দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত হতে পারে।

এ প্রসঙ্গে তার চরিত্রের তুলনা করা যেতে পারে। ইন্দ্র বীর্যবান, সোমরস পান করতে ভালোবাসেন। তার যোদ্ধা হিসেবে ভূমিকাটিই সব থেকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বৃত্রকে হত্যা করে মেঘ থেকে বারিবর্ষণের পথ সুগম করে দেয়। আর্য জাতির বন্ধু। দাস জাতির শত্রু। দাস জাতির শত শত দুর্গ ধ্বংস করে পুরন্দর নামে খ্যাতি লাভ করেছিল। ইন্দ্র মহৎ নয়— বীর। বরুণ বীর নয়। নানা মহৎ গুণের আধার। নানা মহৎ কর্মে আত্মনিয়োগ করে ধৃতব্রত আখ্যা পেছে। ইন্দ্রকে আমরা ভয় করবো; কিন্তু বরুণকে আমরা ভক্তি করব।

১৪. দ্যু : দ্যু সম্বন্ধে কোনও পৃথক সূক্ত ঋগ্বেদে নেই। দ্যু ও পৃথিবীকে যুক্ত করে গুটি কয়েক সূক্ত পাওয়া যায়। সে সূক্তগুলো থেকে দ্যু সম্বন্ধে পৃথক ধারণা করা যায় এমন কোনও তথ্য পাওয়া যায় না। মোটামুটি দ্যুকে বিশ্বের পিতা বলে কল্পনা করা হয়েছে এবং পৃথিবীকে মাতারূপে কল্পনা করা হয়েছে। বিশ্বের পিতা-মাতা হিসেবে তাদের যুক্তভাবে গুণ-কীর্তন আছে এবং তাদের কাছে অনেক ধরনের প্রার্থনা নিবেদিত হয়েছে।

১৫. অশ্বিযুগল : অশ্বিদ্বয়ের ওপর গুটি পঞ্চাশেক সূক্ত রচিত হয়েছে। তাদের রথের তিনটি চাকা আছে, রথটি ত্রিকোণ (১/৩৪/৫)। তাদের প্রথমে আকাশে আবির্ভাব হয়। ঊষা তাদের অনুসরণ করে (১/৪৬/১৪১)। তারা চবন ঋষিকে জরামুক্ত করেছিল (১/১১৬/১০)। এবং ঋজ্রাশ্বকে দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে দিয়েছিল (১/১১৬/১৬); তারা উৎকৃষ্ট ভিষক (১/৫৭/৬)। অশ্বিদ্বয় মধুবিদ্যা-বিশারদ (৫/৭৫/৯)। মধুবিদ্যা কি জানা নেই। বৃহদারণ্যক উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম ব্রাহ্মণে মধুবিদ্যার কথা আছে। কিন্তু আধ্যাত্মবিদ্যার সমার্থবোধক। সে-অর্থে নিশ্চিত ঋগ্বেদে তা ব্যবহৃত হয়নি।

www.pathagar.com

অশ্বিযুগলের বিষয়ে সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক যে তথ্য পাওয়া যায় তাহলো তারা সূর্যের দুহিতা সূর্যাকে বিবাহ করেছিল। এ বিষয়ে ১/১১৯/৫ ও ৫/৭৩/৫ সূক্তে উল্লেখ আছে। কিন্তু এ দুই দেবতার সঙ্গে সূর্যার বিবাহের বিস্তারিত বিবরণ পাই ১০/৮৫ সূক্তে।

যেখানে বলা হয়েছে, সোম, সূর্যার পাণিপ্রার্থী ছিল; কিন্তু সে অশ্বিদ্বয়কেই পতিত্বে বরণ করে। সুতরাং এখানে একটি অভিনব তথ্য পাওয়া যায়। বৈদিক যুগে এক নারীর একাধিক পতি থাকতে পারতো। সুতরাং দ্রৌপদীর সঙ্গে পঞ্চপাণ্ডবের বিবাহের অতীতে যে কোনও নজির ছিল না তা বলা যায় না।

১৬. ঊষা : ঊষা আকাশের দুহিতা (১/৯২/৭)। সূর্য তার পতি (১/৯২/১১)। ঊষা রাত্রির ভগিনী (১/১১৩/৩)। ঊষা অরুণ অশ্বযুক্ত রথে আগমন করে এবং আগে আগে গিয়ে সূর্যের গমনের জন্য পথ প্রস্তুত করে দেয় (১/১১৩/১৬)। গৃহিণী জাগরিত হয়ে যেমন সকলকে জাগরিত করে ঊষা তেমন বিশ্ববাসীকে জাগরিত করে (১/১২৪/৪)। ঊষা আদিত্যের দুহিতারূপেও কল্পিত (৪/৫১/১)। বিকল্পে বলা হয়েছে ঊষা অরুণ বর্ণ বলীবর্দ রথে যোজনা করে (৫/৮০/৩)।

১৭. রাত্রি : কেবল রাত্রিকে বিষয় করে মাত্র একটি সূক্ত পাওয়া যায়। তবে ঊষা সম্বন্ধে যেসব সূক্ত রচিত হয়েছে তাদের মধ্যে অনেকগুলোতে রাত্রি সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। রাত্রি কৃষ্ণবর্ণ ও ঊষা শুভ্রবর্ণা (৬/১২৩/৯)। উভয়ে পরস্পর ভগিনীরূপে কল্পিত। তাদের মধ্যে কোনও বিরোধ নেই। কেউ কাউকে বাধা দেয় না এবং স্থিরভাবে অবস্থান করে না। তারা একের পর অন্যে একই পথে বিচরণ করেন (১/১১৩/৩)। ঊষা রাত্রির জ্যেষ্ঠা ভগিনী (১/১২৪/৮)। রাত্রি নক্ষত্রযুক্ত হয়ে শোভা ধারণ করে। ঊষার আগমনে যেমন নানা জীব জেগে ওঠে রাত্রির আগমনে সকল শয়ন করে নিদ্রা যায়। রাত্রি আকাশের কন্যা (১০/১২৭/৮)।

১৮. যম : যম সম্বন্ধে মাত্র দুইটি সূক্ত আছে। দুটিই দশম মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত। প্রথমটিতে (১০/১৫) যম ও যমীর কথোপকথন পাই। যম ও যমীর সম্বন্ধে ভ্রাতা ও ভগিনী। এখানে যমী যমের সঙ্গে সহবাস কামনা করছে। কিন্তু যম প্রত্যাখ্যান করছে এই বলে যে সহোদরা ভগিনী অগম্যা। ভগিনীতে যে উপগত হয় সে পাপী। অপর সূক্তটিতে (১০/১৪) যম সম্বন্ধে কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। যম পিতৃ-লোকের রাজা। তা স্বর্গে অবস্থিত। প্রেতাত্মাদের যমই পথ দেখিয়ে সেখানে নিয়ে যায়, সে স্থান আলোকোজ্জ্বল। পিতৃ-লোকের দ্বারের পাহাড়া দিচ্ছে দুটি কুকুর। তাদের বর্ণ বিচিত্র এবং চারটি করে চক্ষু।

www.pathagar.com

১৯. বৃহস্পতি : মনে হয় বৃহস্পতির সঙ্গে ব্রহ্মণস্পতির খুব ঘনিষ্ঠ সংযোগ আছে। বৃহস্পতি মন্ত্র উৎপাদন করে (২/১৩/১) এবং বৃহস্পতি মন্ত্রসমূহের স্বামী (২/২৩/১)। বৃহস্পতি ভালো মন্ত্র উচ্চারণ করে (১/৪০)। বৃহস্পতি পুরোহিত (২/২৪/৯)। বৃহস্পতি প্রভূত প্রজ্ঞাবান (৪/৫০/২)। বৃহস্পতি অমিত্রদের অভিভূত করে এবং পূরী সকল বিদীর্ণ করে (৬/৭৩/২)। এখানে মনে হয় সে ইন্দ্রের অনুরূপ আচরণ করে।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, বেদ থেকে দেবতাদের সংখ্যা কত সুনির্দিষ্টরূপে তা জানা সম্ভব নয়। ৩/৯/৯ এবং ১০/৫১/৬ ঋক অনুযায়ী এ সংখ্যা যে ৩৩৩৯; ইতোপূর্বে সেকথা আমরা জানতে পেরেছি। অথচ কোনও বেদেই এত দেবতার নাম এবং পরিচয় খুঁজে পাওয়া যায় না।

এ সংখ্যার মধ্যে যে, প্রস্তর খণ্ড, ধনুক, মণ্ডুক (ভেক) প্রভৃতিকেও দেবতা হিসেবে ধরা হয়েছে ইতোপূর্বে সেকথাও আমরা জানতে পেরেছি। এমতাবস্থায় আসলে দেবতা বলতে কী বোঝায় বেদ থেকে সেকথা বুঝতে পারা সম্ভব নয়।

ওপরে প্রসিদ্ধ এবং প্রায় সর্বজনপরিচিত কতিপয় দেবতার নাম এবং সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। এর মাঝে রাত্রি, ঊষা, পর্জন্য, সূর্য, সবিতা, প্রভৃতি প্রাকৃতিক অবস্থা এবং প্রাকৃতিক পদার্থকে দেবতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এদের যে পরিচয় ব্যক্ত করা হয়েছে তাও অদ্ভুত।

বরুণ, বিষ্ণু, ইন্দ্র, রুদ্র প্রভৃতির যেসব পরিচয় পাওয়া যায় তা থেকে এরা প্রসিদ্ধ বীর অথবা বিশেষ প্রভাবশালী মানুষ ছিল বলে ধরে নেয়া যেতে পারে। তবে এদের কার্যকলাপ এবং অলৌকিকত্ব সম্পর্কে যেসব কথা বলা হয়েছে তা থেকে এদের অতিমানব বলে ধারণা সৃষ্টিই স্বাভাবিক, আর হয়েছেও তাই।

আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই বলতে পারি যে, মূর্তি বা প্রতিমা বলতে বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি বা প্রতিমাকেই বোঝায় এবং এসব মূর্তি বা প্রতিমাদেরকেই উপাস্যজ্ঞানে পূজা করা হয়ে থাকে। সে কারণেই দেবদেবী বা দেবতা বলতে কী বোঝায় এতক্ষণ সেসম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

বৈদিক যুগে দেবদেবী বা দেবতাদের প্রতি বিশ্বাস গড়ে ওঠার প্রমাণ এ আলোচনা থেকে পাওয়া গেল। এখন জানা আবশ্যক যে, সেসময়ে এসবের মূর্তি নির্মাণ এবং পাদ্য অর্ঘ ও ভোগ-নৈবেদ্য প্রভৃতি দিয়ে আধুনিককালের মতো পূজার্চনার ব্যবস্থা ছিল কি না।

সেকথা জানতে হলে তখনকার উপাসনা পদ্ধতির সাথে আমাদের অবশ্যই পরিচিত হতে হবে। অতএব সেসম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করা যাচ্ছে :

বেদ এবং গীতায় চার শ্রেণীর মানুষের কথা বলা হয়েছে। তা হলো আর্ত, অর্থার্থী, ভক্ত এবং জিজ্ঞাসু।

www.pathagar.com

যে আর্ত সে বিপদ থেকে পরিত্রাণ লাভ, যে অর্থার্থী সে অভাব বা ইচ্ছা পূরণ, যে ভক্ত সে শ্রদ্ধা নিবেদন আর যে জিজ্ঞাসু সে তার অনুসন্ধিৎসা মিটানোর জন্য কোনও না কোনও শক্তির উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানায় এবং প্রাণের আকুতি প্রকাশ করে।

বেদের বিভিন্ন মন্ত্র থেকে এটা অনায়াসেই বুঝতে পারা যায় যে, বৈদিক যুগের প্রথম দিকে আর্ত এবং অর্থার্থীর মনোভাব নিয়েই ভিন্ন ভিন্ন কল্পিত দেবদেবী তথা অগ্নি, বায়ু, সূর্য প্রভৃতি প্রাকৃতিক পদার্থ, রাত্রি, ঊষা, পর্জন্য প্রভৃতি প্রাকৃতিক অবস্থা এবং ইন্দ্র, বরুণ, যম, বিষ্ণ প্রভৃতি বীর বা অনন্য সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে প্রশস্তিমূলক বেদমন্ত্র রচনা করে উপাস্য জ্ঞানে তাদের উদ্দেশ্যে তা পাঠ করা হয়েছে এবং কাতরভাবে প্রাণের আকুতি প্রকাশ করা হয়েছে।

বৈদিক যুগে এ প্রশস্তি গান ও আকুতি প্রকাশের রীতিটি ছিল অনন্যসাধারণ। পৃথিবীর কোনও দেশে এটা প্রচলিত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায় না। এ রীতির নাম যজ্ঞ। অবশ্য পারস্যের মানুষেরা যজ্ঞের অনুকরণে অগ্নিপূজা করতেন বলে প্রমাণ রয়েছে।

ইতোপূর্বের আলোচনা থেকে এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, সেকালের ঋষিরা প্রকৃতির বুকে সেখানেই শক্তি বা সৌন্দর্যের বিকাশ লক্ষ্য করেছেন তার ওপরেই দেবত্ব আরো করে স্তোত্র রচনা করছেন। এ স্তোত্রের নাম তারা দিয়েছেন সূক্ত।

বলাবাহুল্য, এমনিভাবেই অগ্নি দেবতার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়। অগ্নি শুধু দেবতা-ই নয়— পুরোহিতও। কেননা অগ্নিতেই অন্য দেবতাদের উদ্দেশ্যে আহুতি প্রদান করা হতো।

এমনভাবে বায়ু, বরুণ, সূর্য প্রভৃতিকে দেবতা এবং উপাস্য বলে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। প্রত্যুষে আকাশের রক্তিমাভায় ঋষিদের মন মুগ্ধ হয়েছে তাই তাকে ঊষা নামে অভিহিত করে দেবত্বের মর্যাদা দেয়া হয়েছে। এদের উদ্দেশ্য স্তবস্তুতি পাঠ এবং প্রাণের আকুতি নিবেদনের জন্য বেদমন্ত্র বা সূক্ত রচনার কথা ইতোপূর্বে আমরা জেনেছি।

কিন্তু শ্রদ্ধা নিবেদন বা প্রার্থনা জানানোর জন্য শুধু স্তোত্র পাঠই যথেষ্ট বলে বিবেচিত হয়নি, তার সাথে কিছু আনুষঙ্গিকেরও প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল। এ আনুষঙ্গিকের নামই হলো যজ্ঞানুষ্ঠান।

সে যুগটি যে খুবই সহজ সরল ছিল সেকথা বলাই বাহুল্য। সেই কারণে যজ্ঞের উপকরণসমূহও ছিল খুবই সাদাসিধা ধরনের এবং সহজলভ্য।

যজ্ঞের জন্য একটি বেদী নির্মিত হতো। তার পাশে একটি গর্ত খনন করা হতো এবং গর্তের নাম দেয়া হয়েছিল যজ্ঞকুণ্ড। কাঠ দিয়ে এ গর্তের মধ্যে অগ্নি

www.pathagar.com

প্রজ্জ্বলিত করা হতো। সঙ্গে সঙ্গে বেদের মন্ত্র পাঠ হতো বা সুর সহযোগে গানের মতো করে গাওয়া হতো।

যজ্ঞের আহুতি হিসেবে অগ্নিতে ঘৃত অথবা সোমলতার রস নিক্ষেপ করা হতো। ঘোড়া, গরু, ছাগল প্রভৃতি পশু এমনকি 'নরমেধ' নামক যজ্ঞে নর বা মানুষও যে আহুতি হিসেবে যজ্ঞকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হয়েছে তেমন প্রমাণও বিদ্যমান রয়েছে।

অগ্নিষ্টোম, জ্যোতিষ্টোম, বিশ্বজিৎ, রাজসূয়, নরমেধ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে এবং ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে এসব যজ্ঞের অনুষ্ঠান হতো বলে জানতে পারা যায়।

এসব যজ্ঞের অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ব্যক্তি নিজ নিজ ভূমিকা পালন করে যেতেন। যজ্ঞের সংজ্ঞা হিসেবে এসব অনুষ্ঠানকে 'দেবতার উদ্দেশ্য দ্রব্য-ত্যাগ যজ্ঞ' বলা হতো।

অর্থাৎ— অগ্নি জ্বালানোর কাঠ, আহুতির জন্য ঘৃত, সোমরস, পশু প্রভৃতি ত্যাগ বা সরবরাহ করতে হতো। যিনি তা করতেন তাকে বলা হতো 'যজমান'। যজমানের কল্যাণ কামনায় যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হতো বলেই এ ত্যাগ বা সরবরাহের দায়িত্ব তাদের বহন করতে হতো।

যজমানের কল্যাণার্থে যারা এ-যজ্ঞ পরিচালনা করতেন তাদের বলা হতো ঋত্বিক। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এদের ভূমিকা ছিল ভিন্ন ভিন্ন, সুতরাং নাম বা উপাধিও ভিন্ন ভিন্ন ছিল।

যিনি এ উদ্দেশ্যে নির্মিত বেদীর ওপর বসে বা দণ্ডায়মান অবস্থায় বেদের সূক্ত পাঠ করতেন তার নাম বা উপাধি 'হোতো'। যিনি সুর সহযোগে গানের মতো করে সূক্ত পাঠ করতেন তার নাম বা উপাধি ছিল 'উদগাতা'। যিনি অগ্নিতে আহুতি প্রদান করতেন তাকে বলা হতো 'অধ্বর্যূ'।

এতো হলো বৈদিক যুগের উপাস্য এবং উপাসনাপ্রণালীর মোটামুটি পরিচয়। এ থেকে সেকালে মূর্তি-নির্মাণ বা মূর্তিপূজার সামান্যতম ইঙ্গিতও আমরা পাইনা। আমরা দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি, বেদের যে হাজার হাজার মন্ত্র রয়েছে তার মাঝে মূর্তি-নির্মাণ বা মূর্তিপূজার সামান্যতম ইঙ্গিত বহন করে এমন একটি মন্ত্রও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

এর একটিমাত্র কারণই থাকতে পারে। আর তাহলো দেবতার মূর্তি-নির্মাণ এবং উপাস্যজ্ঞানে পূজা করার সাথে গোটা বৈদিক যুগের মানুষদের সামান্যতম পরিচয়ও ছিল না।

ওপরের এ-কথাটিকে স্মৃতিপটে জাগরুক রেখে অতঃপর আমরা বৈদিক যুগের পরবর্তী উপনিষদীয় যুগে মূর্তিপূজার উদ্ভব ঘটেছিল কি না সেকথা জানতে চেষ্টা করবো।

www.pathagar.com

হবে আমাদের সাথে সাথে একথাও মনে রাখতে হবে যে, পৃথিবীর সকল
া একই সময়ে এবং একই সাথে মূর্তিপূজার উদ্ভব ঘটেনি। আর যেসব
শ মূর্তিপূজার অবসান ঘটেছে তাও একই সময়ে এবং একই সাথে সংঘটিত
হয়নি। তাছাড়া 'বৈদিক যুগ' বলতে যে বেদ-অধ্যুষিত এবং বেদের শিক্ষা
প্রচলিত ছিল এমন অঞ্চলকেই বুঝতে হবে সে-কথাটিও আমাদের মনে থাকা
প্রয়োজন।

উপনিষদের দেবতা

উপনিষদের দেবতা সম্পর্কে জানতে হলে প্রথমেই উপনিষদ বলতে কি বোঝায় সেকথা জানা প্রয়োজন।

উপনিষদ বেদেরই অঙ্গ-বিশেষ। কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড হিসেবে বেদের মোটামুটি দুটি ভাগ রয়েছে। যজ্ঞ সম্পর্কীয় বিষয়গুলো কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত আর বিভিন্ন তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচিত বিষয়গুলো জ্ঞানকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। উপনিষদে বিশেষভাবে ব্রহ্মতত্ত্বের আলোচনা থাকায় এটিকে জ্ঞানকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত বলে ধরে নিতে হয়।

কোনও পণ্ডিত উপনিষদকে 'রহস্যপক জ্ঞান' বলে ব্যাখ্যা করেছেন। তার মতে এ-জ্ঞান রহস্যপূর্ণ বিধায় শিক্ষার্থীদের গুরুর সান্নিধ্যে বসে অর্জন করতে হতো বলে এর নাম হয়েছে উপনিষদ। কোনও পণ্ডিতের মতে উপনিষদ বলতে বোঝায় একটি সভা। যেখানে গুরু থেকে সামান্য ব্যবধানে শিক্ষার্থীরা তাঁকে ঘিরে বসতো এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করতো। গুরুর সান্নিধ্যে বসে এ-জ্ঞানের চর্চা করা হতো বলে এর নাম হয়েছে উপনিষদ।

অষ্টোত্তর শত উপনিষদের সংকলক পণ্ডিত বাসুদেব শর্মার মতে 'উপ' অর্থে বোঝায় গুরুর উপদেশ থেকে যা লাভ করা যায়; 'নি' অর্থে নিশ্চিত জ্ঞান আর 'সৎ' অর্থে বোঝায় যা জন্ম-মৃত্যুর বন্ধনকে খণ্ডন করে। সুতরাং উপনিষদের অর্থ দাঁড়ায়— 'গুরুর নিকট থেকে লব্ধ যে নিশ্চিত জ্ঞান জন্ম-মৃত্যুর বন্ধনকে খণ্ডন করে।

নানা কারণে কোনও কোনও পণ্ডিত এ-অর্থ গ্রহণ করতে পারেননি। তাঁদের মতে উপনিষদ অর্থ যা এক প্রান্তে অবস্থিত। অর্থাৎ বেদের এক প্রান্তে রয়েছে বলেই এর নাম হয়েছে উপনিষদ।

উপনিষদকে বেদান্তের সমার্থবোধক বলেও ধরে নেয়া যেতে পারে। কারণ বেদান্তের অর্থও হলো যা বেদের অন্তে বা শেষে রয়েছে।

www.pathagar.com

উপনিষদের এ-অর্থই গ্রহণযোগ্য বলে আমরা মনে করি। কারণ এতে ব্রহ্মতত্ত্ব সম্পর্কীয় আলোচনা রয়েছে। কথাটিকে পরিষ্কার করে বুঝতে হলে সামান্য পটভূমিকা প্রয়োজন। পটভূমিকা হলো :

বৈদিক যুগের প্রথম দিকে সাধারণ মানুষ বিশেষ করে বৈদিক ঋষিদের মধ্যে যে 'আর্ত' বা 'অর্থার্থী'র মানসিকতা বিরাজমান ছিল সেকালে রচিত বেদমন্ত্রের উদ্ধৃতি এবং ভাষ্যকারের অভিমত থেকে ইতোপূর্বে আমরা সেকথা জানতে পেরেছি।

অবশ্য এ মানসিকতা গড়ে ওঠার যথেষ্ট কারণও ছিল। বিষয়টি খুলে বললে বলতে হয় যে, জড়া, ব্যাধি, মৃত্যু, ঝড়, তুফান, ভূমিকম্প, প্লাবন, মড়ক, মহামারী, হিংস্র স্বাপদ, শত্রুদল প্রভৃতির আক্রমণে প্রতিরোধ প্রতিরক্ষার উপায়-অবলম্বনহীন সেদিনের দুর্বল অসহায় মানুষের মাঝে আর্ত-মানসিকতা সৃষ্টি হওয়া মোটেই অন্যায় বা অস্বাভাবিক ছিল না।

অনুরূপভাবে বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য, পানীয়, আশ্রয়, আত্মরক্ষা প্রভৃতির অলংঘ্য তাকীদ স্বাভাবিক নিয়মেই তাদের মধ্যে সহজে ও নির্বিঘ্নে প্রচুর খাদ্য, পর্যাপ্ত পশু-সম্পদ, অঢেল পরিমাণ বিত্ত-বৈভব প্রভৃতি লাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা বা অর্থার্থীর মানসিকতা সৃষ্টি করে ছিল। এটাকেও নিশ্চিতরূপে অন্যায় বা অস্বাভাবিক বলা যেতে পারে না।

অবশ্য এ মানসিকতা সৃষ্টির অন্য একটি কারণও ঘটে গিয়েছিল বলে জানতে পারা যায়। সে কারণটি হলো— সামাজিক অনৈক্য ও বিশৃঙ্খলা। বিষয়টিকে খুলে বললে বলতে হয় :

ভিন্ন ভিন্ন গুণ বা ভিন্ন ভিন্ন শক্তিসম্পন্ন ভিন্ন ভিন্ন দেবতার কল্পনা সমাজে ভিন্ন ভিন্ন দল-উপদল এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে বিভেদ-বৈষম্যের সৃষ্টি করে চলেছিল।

উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, সমাজে জড়াগ্রস্ত, রুগ্ন, দরিদ্র, বিদ্যার্থী, যোদ্ধা, ব্যবসায়ী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার এবং ভিন্ন ভিন্ন পেশার মানুষ রয়েছে।

এমতাবস্থায় জড়াগ্রস্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিরাই জড়া থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য 'জড়া-নাশী' দেবতার সন্তুষ্টি বিধানের প্রয়োজন অনুভব করে এবং তার উপাসনায় রত হয়। জড়াগ্রস্ত নয় বা যাদের জীবনে জড়াগ্রস্ত হতে হয় না সে বা তারা সারাজীবন 'জড়া-নাশী' দেবতার উপাসনা করে না বা তার প্রয়োজনও বোধ করে না।

অনুরূপভাবে বিদ্যার্থী ব্যক্তি বা ব্যক্তিরাই উপাসনা আরাধনার মাধ্যমে বিদ্যাদেবীর সন্তুষ্টি অর্জনে প্রয়াসী হয়ে থাকে। বিদ্যার্জনের প্রয়োজন বোধ করে

www.pathagar.com

না এমন ব্যক্তিরা জীবনে কখনো বিদ্যাদেবীর উপাসনা করে না বা করার প্রয়োজন বোধ করে না। তারা হয়তো তাদের প্রয়োজনানুযায়ী কেউবা ধনদাত্রী দেবীর, কেউবা শক্তিদাতা দেবতার আবার কেউবা অন্য দেবতার উপাসনাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে।

এমনিভাবে প্রয়োজনের তাকীদে এক এক দল এক এক দেবতাকে নিজেদের প্রধান বা একমাত্র উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করে বা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। বলাবাহুল্য, এ ভিন্নতার কারণে পরস্পরের মধ্যে ব্যবধান, দলাদলি এবং হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি না হয়ে পারে না।

বর্তমানেও আমরা শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, গানপত্য, দ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবাদী প্রভৃতি অসংখ্য দল-উপদল এবং তাদের পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষপূর্ণ কার্যকলাপ স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি।

মনে রাখা প্রয়োজন যে, আলোচ্য সময়েই এটার সূত্রপাত ঘটেছিল এবং তারই জের হিসেবে আজও সেই দলাদলি ও বিভেদ-বৈষম্য বিদ্যমান রয়েছে, হয়তো চিরদিনই বিদ্যমান থাকবে।

তবে বৈদিক ঋষিরা এ 'বহুদেববাদ'-এর কুফল উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং তার অবসান ঘটানোর উদ্যোগও গ্রহণ করেছিলেন।

ফলে স্বাভাবিকভাবেই বহুদেববাদ-এর অবসান ঘটিয়ে ভিন্ন ভিন্ন দল-উপদলের মনোযোগকে একটি মাত্র কেন্দ্রের প্রতি নিবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন।

তাছাড়া সে-সময়ে তাঁদের মন-মানসও গভীরতর চিন্তার উপযোগী হয়ে গড়ে উঠেছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। এ অবস্থায় আর্ত ও অর্থার্থীর মানসিকতা পরিবর্তিত হয়ে সেখানে যে ভক্তি ও জিজ্ঞাসার মানসিকতা সৃষ্টি হয়েছিল ইতোপূর্বে সেকথাও আমরা জানতে পেরেছি। তবে ভক্তি অপেক্ষা জিজ্ঞাসার দিকটিই যে সমধিক প্রবল ছিল। পরবর্তী আলোচনা থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে।

মূল বক্তব্য শুরু করার পূর্বে ভক্তি এবং জিজ্ঞাসা সম্পর্কে দুকথা বলার প্রয়োজন বোধ করছি :

ভক্তিভাজন বা ভক্তিভাজনদের প্রতি ভক্তি থাকা যে অপরিহার্য এবং একটি বিশেষ মানবীয় গুণ সেসম্পর্কে দ্বিমতের কোনও অবকাশই থাকতে পারে না। তাছাড়া ভক্তির সাথে মুক্তির সম্পর্ক যে অতীব ঘনিষ্ঠ সেকথাও কেউ অস্বীকার করতে পারে না।

কিন্তু সেখানেও কে প্রকৃত ভক্তি-ভাজন আর কে তা নয়, কার প্রতি কতটুকু ভক্তি থাকা সঙ্গত ও স্বাভাবিক আর এ ভক্তি সৃষ্টি হওয়ার মূল কারণ কি প্রভৃতি

www.pathagar.com

বিষয়গুলোও বিশেষভাবে ভেবে দেখতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও ভেবে দেখতে হয় যে, এ-ভক্তির মধ্যে অতিভক্তি, অন্ধভক্তি, কপটতা, ভাব-প্রবণতার উচ্ছ্বাস প্রভৃতির সামান্যতম অস্তিত্ব রয়েছে কি না।

অনুরূপভাবে জিজ্ঞাসু মন-মানসিকতার প্রশ্নেও বলা যেতে পারে যে, জিজ্ঞাসা বা অনুসন্ধিৎসা মানুষের একটি স্বাভাবিক বৃত্তি। এ-বৃত্তিই তার মাঝে অজানাকে জানার উৎসাহ ও প্রেরণা সৃষ্টি করে; নিত্য নতুনের সন্ধানে হাতছানি দেয়।

কিন্তু এ জিজ্ঞাসা বা অনুসন্ধিৎসারও একটা নীতি-নিয়ম আছে, মাত্রা পরিমাণ আছে, ভালো মন্দ আছে। এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন নেই। কেননা, অবান্তর, অপ্রয়োজনীয় এবং প্রজ্ঞাহীন জিজ্ঞাসা আর ভুল বিভ্রান্তি কর, মিথ্যা, হেয়ালিপূর্ণ, অনুমান-নির্ভর এবং দুর্বোধ্য উত্তর যে ব্যক্তি, সমাজ, এমনকি গোটা জাতীয় জীবনে কত বড় অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে পারে তার বহু বাস্তব নিদর্শন ইতিহাসের পাতা এবং আমাদের চোখের সম্মুখেও বিদ্যমান রয়েছে।

আলোচ্য সময়ে ভক্তি ও জিজ্ঞাসা সম্পর্কে এসব কথা চিন্তা করার মতো মন-মানসিকতাই গড়ে উঠেছিল না। সুতরাং তদানিন্তন মন-মানস দিয়ে যতটুকু চিন্তা করা সম্ভব ততটুকু চিন্তাই যে তাঁরা করেছিলেন সেকথা অনায়াসে ধরে নেয়া যেতে পারে। আর তার পরিণাম যা হওয়া স্বাভাবিক তাই যে হয়েছিল অতঃপর তথ্য প্রমাণাদির সাহায্যে সেকথাই তুলে ধরা হবে।

বিখ্যাত এবং হিন্দুসমাজের সর্বজনমান্য শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে বলা হয়েছে :

তদেবাগ্নিস্তদাদিত্য স্তদবায়ু স্তদু চন্দ্রমাঃ।
তবেদ শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদাপস্তং প্রজাপতিঃ।

অর্থাৎ— সেই অগ্নি, আদিত্য, পবন, সোম, শুক্র, ব্রহ্ম, সলিল এবং প্রজাপতি সেই পরমাত্মা ব্যতীত এ ব্রহ্মাণ্ডে আর কিছুই নেই। এ অখিল সংসার ব্রহ্মময়।

অগ্নি, আদিত্য, সোম, পবন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দেবতা বা প্রাকৃতিক পদার্থসমূহ দৃশ্যত ভিন্ন ভিন্ন হলেও আসলে তারা যে পরস্পর থেকে ভিন্ন এবং বিচ্ছিন্ন নয় এবং ব্রহ্ম নামক বিশ্বব্যাপী বিরাজিত এক মহান সত্তারই অংশস্বরূপ এবং সেই যে ওসবের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশিত করেছেন ভিন্ন ভিন্ন দেবতার উপাসকদের সেকথা বোঝানো এবং এতদ্বারা তাদের মনোযোগ একটি মাত্র কেন্দ্রের প্রতি নিবদ্ধ করাই এ-মন্ত্রের মূল লক্ষ্য।

www.pathagar.com

অতঃপর আরো এক ধাপ অগ্রসর হয়ে উক্ত উপনিষদের পরবর্তী তৃতীয় শ্লোকটিতে বলা হয়েছে :

ত্বংস্ত্রী ত্বং পুমানসি খং
কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বন্চয়সি
ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতো মুখঃ ॥

অর্থাৎ— হে দয়াময় ভগবান! তুমিই নারী, তুমিই পুরুষ, তুমিই শিশু, তুমিই বালিকা এবং তুমিই বৃদ্ধরূপে দণ্ড ধারণপূর্বক অনন্ত জগতে বিদ্যমান।

প্রসিদ্ধ ভাগবত গ্রন্থের রচয়িতা বিষয়টিকে সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে সহজে বোধগম্য এবং বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য স্বয়ং ভগবানের বরাত দিয়ে ঘোষণা করলেন :

সর্বভূতে স্বাত্মনি চ সর্বাত্মাহমব স্থিত;
মামেব সর্বভূতেষু বহিরন্তর পা বৃতম্।
ঈক্ষেত চাত্মনি চাত্মা নং যথা খমম লাশয়ঃ
বিসৃজ্যস্ময় মানান স্নান দৃশং ব্রীড়াঞ্চ দৈহিকী
প্রণমেদ্দণ্ডবৎ ভুমা-বশ্ব চাণ্ডাল গোখরম্ ॥

অর্থাৎ— আমি সর্বাত্মা; আমি তোমার হৃদয়েও আছি, সর্বভূতেও আছি। নির্মল চিত্ত হয়ে আপনাতেও সর্বভূতে আমাকে ভেতরে বাইরে পূর্ণ দর্শন করবে। সে সর্বভূতে আমার সত্তা দর্শন করে তার অহংকার, স্পর্ধা, অসূয়া ও অভিমান নাশ হয়ে থাকে। লজ্জা পরিত্যাগ এবং স্বজনের পরিহাস উপেক্ষা করে কুকুর, চণ্ডাল, গো-গর্দভ পর্যন্ত সমুদয় জীবকে দণ্ডবৎ প্রণাম করবে।[১]

এখানে স্বভাবতই প্রশ্ন দেখা দেয় যে, বিশ্বের সবকিছুই যদি ব্রহ্মের অংশ বা ব্রহ্মময় হয় তবে চণ্ডাল কুকুর গো-গর্দভ প্রভৃতিকে দণ্ডবৎ প্রণাম করার এ নির্দেশ কে পালন করবে? আর কেনইবা পালন করবে?

এক্ষেত্রে তো মান-মর্যাদা এবং অধিকারের দিক দিয়ে বিশ্বের ছোটবড়, ইতর-ভদ্র, মানুষ-জানোয়ার প্রভৃতি সবকিছুই সমান, ব্রহ্মময় এবং ভেদাভেদহীন।

যেহেতু প্রণাম বা নমস্কার করার অর্থই হলো কারো প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন বা নীচতা স্বীকার করা। এমতাবস্থায় যেখানে ছোট বড় বা ভেদাভেদ নেই সেখানে আনুগত্য প্রদর্শন বা নীচতা স্বীকারের প্রশ্নই উঠতে পারে না।

---

১. ভাগবত পুরাণ এবং জগদীশ চন্দ্র ঘোষ প্রণীত 'ভারত আত্মার বাণী'; ৫০ পৃঃ।

www.pathagar.com

এমনকি এক্ষেত্রে স্বয়ং ভগবানও কারো প্রণাম বা আনুগত্যের দাবি করতে পারেন না। কেননা সবই তো তিনি। অতএব কার কাছে তিনি আনুগত্যের দাবি করবেন? আর কেনইবা করবেন?

এসম্পর্কে আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, সেটা ছিল বিশেষভাবে জিজ্ঞাসার যুগ। কাজেই একটি জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজতে গিয়ে তদানিন্তন ঋষিদের মনে অসংখ্য জিজ্ঞাসা এসে নতুন করে ভীড় জমিয়েছে এবং ঋষিরাও তাদের নিজ নিজ যোগ্যতা এবং দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী ওসবের এক একটা উত্তর সাব্যস্ত করতঃ বেদমন্ত্র রচনা করেছেন।

পৃথিবীতে যত জিজ্ঞাসা আছে এবং হতে পারে তার মধ্যে ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর সম্পর্কীয় জিজ্ঞাসাটিই সর্বাধিক জটিল, সূক্ষ্ম এবং গুরুত্বপূর্ণ।

অথচ সকল মানুষের চিন্তাশক্তি সমান নয়; চিন্তার গভীরতা এবং ব্যাপকতাও সকলের সমান বা একইরূপ হতে পারে না। ফলে ব্রহ্মতত্ত্ব নিয়ে যে মতভেদের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে সেকথাটি আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে।

তাছাড়া স্বাভাবিক প্রগতিশীলতা এবং পরিবেশের ভিন্নতার কারণে একই ব্যক্তির একদিনের চিন্তাধারা যে অন্যদিন পরিবর্তিত হতে পারে এবং তার ফসলও যে সম্পূর্ণ ভিন্ন এমনকি বিপরীতমুখীও হতে পারে সে-কথাটিও আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখতে হভে। এ-সম্পর্কে একটি মাত্র উদাহরণই যথেষ্ট হবে বলে মনে করি।

ইতোপূর্বে শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের যেসব শ্লোক উদ্ধৃত করা হয়েছে তার একটিতে ঋষি বলেছেন—

"সেই অগ্নি, আদিত্র, পবন, সোম, শুক্র, ব্রহ্ম, সলিল এবং প্রজাপতি"। অথচ উক্ত ঋষিই সেই উপনিষদের অন্যত্র বলছেন—

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্র তারকং
নেমা বিদ্যুতো ভাণ্ডি কু তো হয় মন্নিঃ
তমেব ভান্ত মনু ভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥[১]

অর্থাৎ— আদিত্যদেবও সেই পরমাত্মার নিকটে প্রকাশ পেতে অক্ষম, তাকে প্রকাশ করতে চন্দ্রেরও সামর্থ নেই সুতরাং অগ্নি তৎ সকাশে কিরূপে প্রকাশ পাবে?

---

১. শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ : ষষ্ঠ অ; ১৪ শ্লোক।

www.pathagar.com

লক্ষণীয় যে, পূর্বোক্ত শ্লোকটিতে যেখানে ব্রহ্ম সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনিই অগ্নি, তিনিই পবন, তিনিই সোম ইত্যাদি বলা হলো সেখানে পরবর্তী এ-শ্লোকটিতে "আদিত্য তাঁর কাছে প্রকাশ পেতে পারে না," "চন্দ্র তাঁকে আলোকিত করতে পারে না" "তারকারা তাঁকে প্রকাশিত করতে পারে না" ইত্যাদি বলা শুধু তাৎপর্যহীনই নয়— পরস্পর বিরোধীও।

এ-পরস্পর বিরোধিতা বা মতভেদের কারণ কি সেসম্পর্কে ইতোপূর্বে আভাস দেয়া হয়েছে, তথাপি বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করার জন্য পুনরুক্তি করে বলা যাচ্ছে যে, সময় এবং পরিবেশের ভিন্নতার কারণে মানুষের চিন্তাধারার পরিবর্তন বা ভিন্নতা সৃষ্টি হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়। আর তার ফসলও যে ভিন্ন এমনকি সম্পূর্ণ বিপরীত ধরনেরও হতে পারে সেকথাও আমাদের মনে রাখতে হবে।

ওপরের এ উদ্ধৃতিদ্বয় সেই ভিন্নতা এবং বৈপরীত্যেরই পরিচয় বহন করছে। এ-সম্পর্কে উক্ত উপনিষদ থেকে আরও একটি উদাহরণ তুলে ধরা যাচ্ছে :

যে না বৃত্তং নিতা মিদং হি সর্ব্বং
জ্ঞঃ কালকারো গুণী সর্ব্ববিদ্যঃ।
তেনে শিতং কর্ম্ম বিবর্ত্তেতে হ
পৃথ্ব্যপ্ তেজো হ নিল খানি চিন্ত্যম্।[১]

অর্থাৎ— যে পরাৎপর পরমেশ্বর নিরন্তর এ ব্রহ্মাণ্ডজুড়ে বিরাজ করছেন, তিনি কালেরও সৃষ্টিকর্তা, সর্ববেত্তা ও অবিদ্যাদি দোষ-বর্জিত। তাঁর আদেশেই ব্রহ্মাণ্ডের কার্য নিষ্পন্ন হচ্ছে। অতএব পূর্বে যে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, বায়ু ও আকাশ এ-পঞ্চভূতকে জগৎ কারণ বলে সন্দেহ হয়েছিল, অধুনা সে-সন্দেহের নিরাময় হয়ে গেল।

প্রথম অবস্থায় কোনও কিছু সম্পর্কে এ-রূপ ধারণা সৃষ্টি, পরবর্তী সময়ে সন্দেহের উদ্রেক এবং উন্নততর জ্ঞান ও বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে অতীত ধারণার পরিবর্তন ও সন্দেহের নিরসন এটা নতুন, অভিনব, এবং অস্বাভাবিক নয়। সুতরাং ঋষিদের বেলায়ও এটা যে ঘটেছে এখানে তারই প্রমাণ আমরা পাচ্ছি।

এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ প্রভৃতিতে হাজার হাজার মন্ত্র বা ঋক রয়েছে। শত শত ঋষি এমনকি তাদের অনেকের স্ত্রী-পুত্রাদি কর্তৃকও সুদীর্ঘ সময়ে এ সব মন্ত্র বা ঋকসমূহ রচিত হয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন ঋষি বা তাঁদের পরিবার পরিজন কর্তৃক এগুলো রচনা, সময়ের ব্যবধান, জ্ঞান ও

---

১. শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ : ষষ্ঠ অ; ২য় শ্লোক।

www.pathagar.com

অভিজ্ঞতার ক্রমবিকাশ প্রভৃতিই যে কোনও কোনও ক্ষেত্রে এক ঋক বা ম
সাথে অন্য ঋক বা মন্ত্রের গড়মিল, পার্থক্য এমনকি বৈপরীত্য ঘটার কা:
ওপরোদ্ধৃত মন্ত্রটি থেকে তারই সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

তাছাড়া ব্রহ্ম-তত্ত্বের মতো এমন একটি অতীব জটিল, সূক্ষ্ম, গুরুত্বপূর্ণ এবং স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে মতভেদ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। আর হয়েছিলও তাই।

মতভেদ যে ক্ষতিকর এবং অবাঞ্ছনীয় সেসম্পর্কে দ্বিমতের কোনও অবকাশই নেই। কিন্তু এ-মতভেদ থেকেই সত্যের সন্ধানে ঋষিদের অক্লান্ত ও নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার সুস্পষ্ট পরিচয় আমরা পেয়ে থাকি।

দেবদেবীদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

সূর্য, অগ্নি, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি নিয়ে বেদের মোট তেত্রিশ দেবতার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে কলিযুগে তেত্রিশ কোটিতে উন্নীত হয়েছে। অথচ সবগুলো পুরাণ, উপপুরাণ, ভাগবত প্রভৃতির কুত্রাপি তেত্রিশ কোটির নাম-পরিচয় খুঁজে পাওয়া যায় না। সূর্য, অগ্নি, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি বৈদিক দেবতাসহ ওসব গ্রন্থে যেসব দেবতা বা দেবদেবীর নামপরিচয় পাওয়া যায় তাদের সংখ্যা চার শতের অধিক নয়। এ চার শতের মধ্যে ইঁদুর, পেঁচা, গাধা, গরু, কুকুর, শৃগাল প্রভৃতিও রয়েছে।

দেবতামাত্রই হিন্দুসমাজের দৃষ্টিতে নমস্য এবং শ্রদ্ধার পাত্র। নমস্কার, শ্রদ্ধা এবং যথাবিহিত ভোগ ও পূজা না পেলে এরা ক্রোধান্বিত হয় এবং অভিশাপ দেয় বলে প্রকাশ। সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে তাদের অভিশাপে অন্ধ, খঞ্জ, বিকলাঙ্গ, রাজ্যহারা, সর্বহারা, জন্তু-জানোয়ার, পোকা-মাকড়, ক্লীব, চণ্ডাল প্রভৃতিতে পরিণত হয়েছেন এমন বহু মানুষের উপাখ্যান পুরাণ ভাগবতাদি গ্রন্থে বিদ্যমান রয়েছে।

এখন স্বভাবতই প্রশ্ন দেখা দেয় যে, এ তেত্রিশ কোটি দেবতার চার শত ছাড়া বাকি বত্রিশ কোটি নিরানব্বই লক্ষ, নিরানব্বই হাজার ছয়শত দেবতা যাদের নামপরিচয় জানা যায় না এবং পূজার্চনা করা হয় না তাদের ক্রোধ
পশমের উপায় কি? তাছাড়া এটা কি তাদের প্রতি চরম উপেক্ষা ও অবজ্ঞা
নয়?

মপরিচয়হীন দেবদেবীর কথা ছেড়ে যাদের নামপরিচয় পাওয়া যায়
যাক। এ চারশত দেবদেবীর মধ্যে যাদের পূজার্চনা করা হয়

www.pathagar.com

তাদের সংখ্যা দুশতের উর্ধ্বে নয়। আবার এ দুশত জনেরও মাত্র কয়েক জনেরই দৈনন্দিন পূজার বিধান রয়েছে। বাদ-বাকিদের বছরে মাত্র একবারই পূজা হয়ে থাকে। বছরে গড়ে দশ হাজার পরিবারের মধ্যে একটি পূজাও অনুষ্ঠিত হয় কি না সেকথা বলা কঠিন। তারপরও সকল সম্প্রদায়ের লোক সকল দেবতার পূজা করেন না। অনেক ক্ষেত্রেই সম্প্রদায় ভিন্ন হলে দেবতাও ভিন্ন হয়ে থাকে। এক সম্প্রদায়ের দেবতাকে পূজা করাতো দূরের কথা দর্শন করাও যে অন্য সম্প্রদায়ের জন্য নিষিদ্ধ এবং মহাপাপ এমন প্রমাণও যথেষ্ট রয়েছে।

এমতাবস্থায় পুরাণের উপাখ্যান সত্য হলে যেসব দেবতার নামপরিচয় জানা বা পূজার্চনা করা হয় না তাদের ক্রোধ এবং অভিশাপে গোটা হিন্দুসমাজই এতদিনে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কথা। অন্তত যারা অন্য সম্প্রদায়ের দেবতা অর্থাৎ দেবমূর্তি দর্শন করাও পাপজনক মনে করেন তাদের তো ক্লীব, চণ্ডাল, অন্ধ, রাজ্যহারা পোকা-মাকড় প্রভৃতিতে পরিণত হতে হতে এতদিনে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়াই ছিল সঙ্গত এবং স্বাভাবিক।

এ পটভূমিকার পর এবারে আসুন দেবদেবীদের জানার চেষ্টা করি। এক্ষেত্রেও দেখা যাবে যে, এ সব দেবদেবী সৃষ্টির পশ্চাতে জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বুদ্ধি, বিবেচনা করতে কোনও কিছুর অস্তিত্ব বিদ্যমান নেই— শুধু ভক্তির সীমাহীন উচ্ছ্বাসেই গোটা সমাজ দিশেহারা হয়ে ছুটে চলেছে।

বেদ এবং উপনিষদের দেবতাদের নামপরিচয় যথাস্থানে তুলে ধরা হয়েছে। সুতরাং এখানে শুধু পুরাণের দেবতা বা দেবদেবীদের মধ্য থেকে প্রসিদ্ধ কতিপয়ের নাম এবং সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হবে।

উগ্রচণ্ডা : তাঁহার অষ্টাদশ ভূজ বা বাহু। সতী এ মূর্তি ধারণ করে দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করে। আশ্বিন মাসের কৃষ্ণা নবমীতে হিন্দুর গৃহে আবির্ভূতা ও পূজিতা হয়। — আশুতোষ দেবের "নূতন বাঙ্গালা অভিধান।"

উগ্রতারা : শুম্ভনিশুম্ভ অসুরদ্বয় দেবতাদের উপর অত্যাচার শুরু করলে দেবতাগণ মতহঙ্গ মুণির আশ্রমে সমবেত হয়ে ভগবতীর আরাধনা করলে মতঙ্গ মুণির স্ত্রী মাতঙ্গীর রূপ ধারণ করে উত্থিত হয় এবং অসুরদ্বয়কে ধ্বংস করে। ঋষিগণ এ মূর্তিকে উগ্রতারা নাম দিয়েছে। মাতঙ্গী (মতঙ্গ মুণির স্ত্রী)-র শরীর হতে উৎপন্ন বিধ্ ভগবতীর এ মাতঙ্গী নাম হয়েছে।

উমা : অপর নাম পার্বতী। হিমালয় পর্বতের কন্যা, মাতার ন
পূর্বজন্মে সে প্রজাপতি দক্ষের কন্যা ছিল। দক্ষে

www.pathagar.com

সহ্য করতে না পেরে দেহত্যাগ করে এবং পর্বতরাজ হিমালয়ের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করে। —ঐ

কাত্যায়নী : মহিষাসুরের আক্রমণ বিপন্ন দেবগণ হরিহরের শরণাপন্ন হলে তাদের মুখমণ্ডল হতে উগ্র তেজ বের হয়ে আসে। সেই তেজ এক কন্যার আকার ধারণ করে কাত্যায়ন ঋষির আশ্রমে পালিত হয় সেই কারণে তার নাম হল— "কাত্যায়নী"। — রামায়ণ

কালী : শুম্ভনিশুম্ভ যুদ্ধে দুর্গাদেবীর ললাট হতে উৎপন্ন হয়। সে রক্তবীজ দৈত্যের রক্ত পান করে তাকে বিনাশ করে। কালী দুর্গার অর্ধাংশ স্বরূপা। সর্বদা কৃষ্ণের ভাবনার জন্য কৃষ্ণ বর্ণা হয়েছে।

— দেবী ভাগবত

দক্ষযজ্ঞে সতী দেহত্যাগ করিলে শিবের নিঃশ্বাস বায়ু হতে কালীর উদ্ভব হয়। — স্কন্দ পুরাণ

চণ্ডী : দুর্গার অপর নাম, রূপও ভিন্ন। শুম্ভাসুরের সেনানী চণ্ড ও মুণ্ডকে বধ করতঃ তিনি এই নাম প্রাপ্ত হন। — মার্কণ্ডেয়পুরাণ

চন্দ্র : ১. ব্রহ্মার পৌত্র, অত্রির পুত্র। দেবগুরু বৃহস্পতির পত্নী তারাকে চন্দ্র হরণ করেছিল। তার গর্ভে চন্দ্রের ঔরসে বুধের জন্ম হয়।

— বিষ্ণু পুরাণ

দক্ষ প্রজাপতির সাতাশ জন কন্যাকে চন্দ্র বিবাহ করে। তার মধ্যে সে রোহিনীর প্রতি বেশি আসক্ত ছিল। বিধায় অপর কন্যাগণ পিতার নিকট অভিযোগ করে। দক্ষ চন্দ্রকে অভিশাপ প্রদান করে যে, সে দিন দিন ক্ষয়প্রাপ্ত হবে। —ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণ

পরে সকল পত্নীর সাথে সমান যত্ন দেখানোর ফলে ঐ ক্ষয়প্রাপ্তি পক্ষকাল ব্যাপী হয় (পদ্ম পুরাণ)। সেই দিন থেকে চন্দ্রের এক পক্ষের ক্ষয় এবং অপর পক্ষে বৃদ্ধি হতে থাকে।

২. সমুদ্রমন্থনকালে চন্দ্রের উদ্ভব হয়।

—আশুতোষ দেবের 'নূতন বাঙ্গালা অভিধান" ১১৬৪ পৃঃ

চামুণ্ডা : ১. শক্তির মূর্তি বিশেষ। মহিষাসুরের মন্ত্রী চণ্ড ও মুণ্ডকে বধ করতঃ তাদের মস্তকের মালা পরিধান করেন। এ জন্য তার চামুণ্ডা নাম হয়। — রামায়ণ

২. মহিষাসুর দৈত্যকে বধ করার জন্য ব্রহ্ম, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের মিলিত দৃষ্টি থেকে এক বৈষ্ণবী মূর্তির সৃষ্টি হয়। এ মূর্তি ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী ও রৌদ্রী এ তিন ভাগে বিভক্তি হয়। রৌদ্রী মূর্তি রুরু নামক দৈত্যকে বধ করে চামুণ্ডা নামে খ্যাত। — বরাহ পুরাণ

www.pathagar.com

ছায়া : সূর্যের পত্নী। সূর্যের প্রথমা পত্নী সংজ্ঞা স্বামীর তেজ সহ্য করতে অসমর্থ হয়ে নিজ দেহ থেকে ছায়াকে সৃষ্টি করে এবং নিজে পিত্রালয়ে চলে যায়। ছায়া সূর্যের পত্নীরূপে অবস্থান করে এবং সংজ্ঞার পুত্র যম প্রভৃতিকে লালন পালন করে। নিজের গর্ভে শনি নামক এক পুত্র জন্মগ্রহণ করলে সে সপত্নী পুত্রদের অবহেলা করতে থাকে। এতে যম ক্রুদ্ধ হয়ে ছায়াকে পদাঘাত করতে উদ্যত হয়। ছায়া "পদহীন হও" বলে অভিশাপ দিলে যম সূর্যের শরণাপন্ন হয়। তখন সকল কথা প্রকাশ হয়ে পড়ে এবং সূর্য সংজ্ঞার অনুসন্ধানে যায়। — হরিবংশ

ছিন্নমস্তা : দশ মহাবিদ্যার এক মহাবিদ্যা। নিজের মস্তক ছিন্ন করে সেই মস্তককে সে বাম হাতে ধরে রাখে এবং স্কন্ধ থেকে নির্গত রক্তধারা পান করে। — দেবী ভাগবত

জগদ্ধাত্রী : কোনও এক সময়ে কতিপয় দেবতা নিজেদের ঈশ্বর বলে ধারণা করতে থাকে। তখন ভগবতী দুর্গা জগদ্ধাত্রীর মূর্তি পরিগ্রহ করে তাদের সম্মুখে আবির্ভূত হয়। সে একখণ্ড তৃণ স্থাপন করে এবং প্রথমে বায়ুকে সেই তৃণ খণ্ড উত্তোলিত করতে বলে। বায়ু অর্থাৎ পবন দেব তা উত্তোলনে ব্যর্থ হয়। তখন অগ্নিদেবকে সেই তৃণ দগ্ধীভূত করতে বলা হয়। সেও ব্যর্থ হয়। তখন দেবরা বুঝতে পারে যে এ মূর্তিই পরমেশ্বরী। সঙ্গে সঙ্গে তারা পরমেশ্বরী জ্ঞানে উক্ত মূর্তির পূজায় রত হয়। জগদ্ধাত্রী দেবীর চারখানা হাত, তিনটি চক্ষু এবং সিংহবাহিনী।

— আশুতোষ দেবের "নূতন বাঙ্গালা অভিধান" ১১৭০ পৃষ্ঠা

জগন্নাথ : রাজা ইন্দ্র-দ্যুম্নের ইচ্ছানুসারে ব্রাহ্মণবেশী বিশ্বকর্মা শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম ও সুভদ্রা দেবীর মূর্তি নির্মাণ করতে থাকে। বিশ্বকর্মা রাজাকে প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ করে ছিল যে, যতদিন মূর্তিত্রয়ের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত না হয় ততদিন সে তা দর্শন করবে না।

পঞ্চদশ দিবস অতীত হলে কৌতূহলবশত রাজা বিশ্বকর্মার অজ্ঞাতে মূর্তি দর্শন করে। রাজা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করায় বিশ্বকর্মা ক
ছেড়ে চলে যায়। তখনো মূর্তির হাত এবং পা নির্মিত হ
না। ব্রহ্মার আদেশে মূর্তিত্রয়কে ঐ অবস্থায়ই রাখা হয়
ঐতিহাসিকদের অনেকের মতে জগন্নাথ বৌদ্ধবিগ্রহ
শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম ও শুভদ্রা দেবীর মূর্তি

www.pathagar.com

যথাক্রমে বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের প্রতীক। উল্লেখ্য, পু
দেবের মন্দির অবস্থিত। প্রতি বছর তথায় এবং
স্থানেই রথযাত্রার উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

জনার্দন : ভগবান বিষ্ণুর অপর নাম। "জন" নামক দৈত্যকে সং .. করে সে এই নাম গ্রহণ করে।

জাহ্নবী : গঙ্গার অপর নাম। গঙ্গা জহ্নুমুণিকে পতিরূপে পেতে ইচ্ছা করে। জহ্নুমুণি অসম্মত হলে গঙ্গা ক্রোধবশতঃ মুণির তপোবন প্লাবিত করে। গঙ্গার এ ব্যবহারে জহ্নুমুণি ক্রুদ্ধ হয়ে গঙ্গার সমস্ত জল পান করে ফেলে। পরে দেবতাদের অনুরোধে সে গঙ্গাকে কর্ণ দ্বারা বের করে ফেলে। মহর্ষিরা গঙ্গাকে জহ্নুর কন্যারূপে স্থির করে। সেই থেকে গঙ্গার নাম হয় জাহ্নবী।

জ্বর : দৈত্যরাজ বাণের সেনাপতি, তার তিনটি মস্তক, নয়টি চক্ষু, ছয়খানি হস্ত ও তিনখানি পদ। শ্রীকৃষ্ণ বাণের হাত হতে অনিরুদ্ধকে উদ্ধার করতে গেলে তাকে আক্রমণ করে এবং শ্রীকৃষ্ণের শরীরে প্রবেশ করে। শ্রীকৃষ্ণের দেহ মধ্যস্ত বৈষ্ণব জ্বর এবং জ্বরকে পরাভূত করে; শ্রীকৃষ্ণ এ জ্বরকে হত্যা করতে উদ্যত হলে ব্রহ্মার অনুরোধে তাকে ছেড়ে দেয় এবং ক্ষমা করে।

— বিষ্ণু পুরাণ

তুলসী : রাধিকার সখী। রাধিকার শাপে তুলসী ধর্মধ্বজ রাজার কন্যা হয়ে জন্মগ্রহণ করে। শঙ্খচুড় দৈত্যের সাথে তার বিবাহ হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তুলসীর প্রতি আকৃষ্ট হলে শঙ্খচুড়ের রূপ ধারণ করে তুলসীর সতীত্ব নষ্ট করে। — ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণ

ত্রিপুরারি : মহাদেব। তারকাক্ষ, কমলাক্ষ ও বিদ্যুন্নালী নামক তিন জন অসুর দেবতাদের ওপর অত্যাচার করায় মহাদেব তাদের ধ্বংস করে এই নাম গ্রহণ করে। — ভাগবত

ত্রিশঙ্কু : অযোধ্যার অধিপতি, সূর্যবংশীয় রাজা। বিশ্বামিত্রের সহায়তায় সশরীরে স্বর্গে গমন করলে দেবরাজ ইন্দ্র তাকে স্বর্গচ্যুত করে। ত্রিশঙ্কু বিশ্বামিত্রের শরণাপন্ন হলে বিশ্বামিত্র দ্বিতীয় স্বর্গ সৃষ্টি করতে প্রবৃত্ত হলে দেবতারা তখন স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যপথে ত্রিশঙ্কুর জন্য স্থান করে দেয়।

ষ্টানামীয় প্রজাপতির পুত্র। এক মুখে বেদ অধ্যয়ন, অন্য মুখে
ন ও তৃতীয় মুখ দ্বারা সমুদয় পৃথিবী গ্রাস করতে উদ্যত

www.pathagar.com

হয়। ইন্দ্রপদ লাভের জন্যও কঠোরভাবে তপস্যা করে। তার এ তপস্যা ভঙ্গ করার জন্য ইন্দ্র কয়েকজন স্বর্গ বেশ্যাকে ত্রিশিরার নিকটে পাঠায়। কিন্তু বেশ্যা ব্যর্থ হয়। তখন ইন্দ্র বজ্র দ্বারা ত্রিশিরাকে নিহত করে এবং কুঠারাঘাতে তার তিনটি মস্তককে দেহচ্যুত করে। তখন এই বিচ্ছিন্ন তিন মস্তক থেকে কপিঞ্জল, কলবিংক ও তিত্তির পক্ষীর উদ্ভব হয়। — মহাভারত

দুর্গা : মহামায়া ভগবতী। দশভুজা বলে পুরাণে বর্ণিত রয়েছে। দশভুজে দশ প্রহরণ ধারণ করে দুর্গাসুর বধ করে বলে এ নাম। সুরথ রাজা সর্বপ্রথম এ দেবীর পূজা করেন। স্কন্দ পুরাণের বর্ণনা থেকে জানা যায়— ভগবান রামচন্দ্র রাবণ বধের নিমিত্ত শরৎকালে এদেবীর অর্চনা করে ছিলেন। এ থেকে শরৎকালে এ পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। দেবী ভাগবতের বর্ণনায় প্রকাশ, রম্ভ নামক অসুরের পুত্র মহিষাসুর পর্বতে অযুত বর্ষাকাল কঠোর তপস্যায় রত হয় এবং "পুরুষ জাতীয় কোনও জীব মহিষাসুরকে বধ করতে পারবে না"— ব্রহ্মার নিকট থেকে এ বর লাভ করে। এ বর লাভের পরে সে ভীষণভাবে দুর্মদ হয়ে ওঠে এবং দেবতাদের স্বর্গরাজ্য দখল করে নেয়। অনন্যোপায় হয়ে দেবতারা সাহায্যের জন্য বিষ্ণু ও শিবের নিকটে সমবেত হয়। তখন দেবতাদের তেজ থেকে দেবী ভগবতী (দুর্গা) উৎপন্ন হয়ে মহিষাসুরকে বধ করে।

প্রত্ন-তাত্ত্বিক ও পুরাতাত্ত্বিকদের অভিমত হলো, অতীতের কোনও এক সময়ে এ-দেশের বিশেষ একটি শ্রেণীর মানুষ বর্ষার পরে শরতের আগমনকে অভিনন্দন জানানোর জন্যে উৎসবে মেতে উঠতো।

তাদের এ উৎসবের উপাদান ছিল কদলী, দাড়মী, ধান্য, হরিদ্রা, কচু, মানকচু, বিল্ব, অশোক ও জয়ন্তী এ নয়টি গাছের পাতা। একে নব পত্রিকা বলা হতো।

পরবর্তী সময়ে এ নব পত্রিকাকে দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক গণেশ, সিংহ, মহিষ, অসূর ও কলাবউ-এর প্রতীক বলে ক করা হতে থাকে। কেউ কেউ 'কলা বউ'কে নব পত্রিকার বলে থাকেন।

রাজশাহীর (বর্তমান নওগাঁ) তাহেরপুরের রাজ নির্দেশে ওপরোক্ত নয়টি মূর্তি নির্মিত হয়

www.pathagar.com

মহাধুমধামের সাথে নব পত্রিকা সহ এ নয়টি মূর্তির পূজার্চনার ব্যবস্থা করেন।

আজও বাংলাভাষী হিন্দুদের মধ্যে নব পত্রিকাসহ এ নয়টি মূর্তির পূজা প্রচলিত রয়েছে এবং আজও এই পূজা 'শারদীয় উৎসব' বলে অভিহিত হয়ে চলছে।

ধূমাবতী : দুর্গার অপর নাম। একবার পার্বতী (দুর্গার অপর নাম) শিবের নিকট খাদ্য প্রার্থনা করে। কিন্তু খাদ্য দিতে শিবের বিলম্ব হয়। তখন পার্বতী শিবকেই ভক্ষণ করে। ফলে তার শরীর থেকে ধুম নির্গত হতে থাকে। সেই থেকে পার্বতীর নাম হয়— ধূমাবতী।

— বৃহদ্ধর্ম

নর-নারায়ণ : বিষ্ণুর চতুর্থ অবতার। ধর্মের-স্ত্রী মূর্তি থেকে তিনি জন্মগ্রহণ করে। সে দুস্কর তপস্যা করেছিল। — ভাগবত

শরভ (অষ্টপদ মৃগ অথবা হস্তি শাবক— লেখক) রূপধারী মহাদেবের দন্তাঘাতে বিষ্ণুর নরসিংহ মূর্তি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে নর ও নারায়ণ নামক ঋষিদ্বয়ের উদ্ভব হয়। — কালিকা পুরাণ

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকেও নারায়ণ বলা হয়।

— আশুতোষ দেবের নূতন বাঙ্গাল৷ অভিধান ৯২০২ পৃঃ

নরসিংহ : বিষ্ণুর (চতুর্দশ) অবতার। হিরণ্যকশিপ নামক বিষ্ণুদ্বেষী দৈত্য ব্রহ্মার বর প্রভাবে নর এবং দেবতাদের অবাধ্য ছিল। তার পুত্র প্রহল্লাদ ছিল বিষ্ণুর পরম ভক্ত। বিষ্ণু-ভক্ত পুত্রকে বিনাশ করার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পরে নিকটস্থ স্ফটিক স্তম্ভে বিষ্ণু আছে কি না সেকথা জানতে চায়। প্রহলাদ দৃঢ়তার সাথে উক্ত স্তম্ভে বিষ্ণুর অস্তিত্ব ঘোষণা করার সাথে সাথে হিরণ্যকশিপুকে দম্ভ সহকারে উক্ত স্তম্ভে পদাঘাত করে। মুহূর্ত মধ্যে অর্ধনর ও অর্ধসিংহরূপী বিষ্ণু স্তম্ভ থেকে বহির্গত হয়ে হিরণ্যকশিপুকে হত্যা করে। — দেবী ভাগবত

পবন দেব : বাতাসের অধিষ্ঠাতা দেবতা। দেবতাদের মধ্যে প্রভুত শক্তিশালী। অঞ্জনার গর্ভে তার পুত্র হনুমান। কুন্তীর গর্ভে ভীম নামক পুত্রের জন্মদান করে। উত্তর-পশ্চিম দিকের রাজা এবং উনপঞ্চাশ বায়ু তার অধীন। — রামায়ণ

-র্গার অপর নাম। হিমালয় পর্বতের কন্যা হিসেবে তার এ পার্বতী -াছে। — আশুতোষ দেবের নূতন বাঙ্গালা অভিধান

www.pathagar.com

মরুৎগণ : কশ্যপ থেকে উৎপন্ন দেবমণ্ডলী। কশ্যপ দক্ষ কন্যাদেরকে বিবাহ করে। ভগিনী অদিতির পুত্র ইন্দ্রকে দর্শন করে সেইরূপ বীর্যবান একটি পুত্র লাভের কামনা তার মনে জাগে। স্বামী কশ্যপ এ কামনার কথা জানতে পেরে দিতির গর্ভধ্যান করে এবং শুচিভাবে থাকতে বলে। অদিতি দিতির এ গর্ভের কথা জানতে পেরে ঈর্ষান্বিতা হয় এবং ইন্দ্রকে উক্ত গর্ভ নষ্ট করার নির্দেশ দেয়। ইন্দ্র দিতির অশুচি অবস্থার সুযোগ নিয়ে তার গর্ভে প্রবেশ করে এবং বজ্র দ্বারা গর্ভস্থ সন্তানকে সপ্ত খণ্ডে বিভক্ত করে। বজ্রাহত সন্তান রোদন করতে থাকে। ইন্দ্র তাকে বলে মা রোদীঃ, মা রোদীঃ (রোদন করিও না)। এ কথা বলতে বলতে প্রতিটি খণ্ডকে আবার সপ্ত খণ্ডে বিভক্তি করে। এ উনপঞ্চাশ খণ্ডে বিভক্ত দিতির সন্তানই মরুৎগণ নামে পরিচিত ও সম্পূজিত হয়ে চলেছে। — দেবী ভাগবত

মহাদেব : সংহারকর্তা ভগবান। ব্যাঘ্র চর্ম পরিধান করে। সর্প তার উত্তরীয়, ভস্ম তার বিভুতি, নন্দী তার অনুচর। তার অস্ত্র ত্রিশূল, ধনু পিনাক। তার পাশুপত নামক অস্ত্রও বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ।

ত্রিপুরাসূরকে বধ করার ফলে তার অন্যতম নাম 'ত্রিপুরারি'। সমুদ্রমন্থনকালে হলাহল উত্থিত হলে সেই হলাহল পান করে। সেই হলাহল তার কণ্ঠে থেকে যায় বলে তার একটি নাম নীলকণ্ঠ। অর্জুনের সাথে ব্যাধ বেশে যুদ্ধ করে। দক্ষ রাজকন্যা সতী তার পত্নীদের অন্যতমা। সতী দক্ষযজ্ঞে পতির নিন্দা সহ্য করতে না পেরে প্রাণত্যাগ করলে মহাদেব বীর ভদ্র নামক অসুরের উৎপত্তি করে তার দ্বারা শ্বশুর দক্ষকে নিহত করায় এবং সতীর মৃতদেহ স্কন্ধে নিয়ে উন্মাদের মতো ভ্রমণ করতে থাকে।

সৃষ্টি ধ্বংসের আশঙ্কা দেখা দেয়ায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মহাদেবকে সম্মোহিত করে। মহাদেব সতীর দেহ পরিত্যাগ করে হিমালয়ে গমন করে এবং তপস্যায় রত হয়। এ সুযোগে শ্রীকৃষ্ণ তার সুদর্শন চক্রের দ্বারা সতী দেহ একান্নটি খণ্ডে বিভক্ত করে। চক্রের ঘূর্ণনে খণ্ডগুলো বিভিন্ন স্থানে পতিত হয় ও সেই স্থানগুলো পীঠ ক তীর্থস্থানে পরিণত হয়। এ স্থানগুলো 'একান্নপীঠ' নামে প্রসিদ্ধ

মহাদেব হিমালয়ে কঠোর তপস্যায় রত হওয়ার ফলে পুন ধ্বংসের আশঙ্কা দেখা দেয়। মদন তপস্যা ভঙ্গ ক গ্রহণ করে। ফলে মহাদেবের ক্রোধে তাকে ভস্ম

অতঃপর হিমালয় পর্বতের কন্যা পার্বতী

www.pathagar.com

অবস্থায় ফিরে আসে এবং পার্বতীকে বিবাহ করে। হিমালয়ের জ্যেষ্ঠ কন্যা গঙ্গাকেও সে বিবাহ করে। — দেবী ভগবত

বিশেষভাবে উল্লেখ্য, মহাদেব শুধু একজন দেবতা-অন্যতম ভগবানও। সংহারকর্তা। অতএব তার পরিচয়ও বিশেষভাবে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হওয়াই স্বাভাবিক। তার এ বৈশিষ্ট্যসমূহকে তুলে ধরতে হলে বিরাট আকারের একখানা গ্রন্থ লিখার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আপাতত তা সম্ভব নয় বলে তার এ বৈশিষ্টসমূহের মধ্যে এখানে শুধু তার পরিবার-পরিজনদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পৃথক পৃথকভাবে তুলে ধরা যাচ্ছে। অবশ্য প্রখ্যাত দেবতা এবং ভগবানদের প্রায় সকলেরই পরিবার পরিজন প্রভৃতি রয়েছে। আলোচনা সংক্ষেপ করার জন্য এখানে শুধু মহাদেবের পরিবার-পরিজনদেরই শাস্ত্রবর্ণিত পরিচয় সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা যাচ্ছে :

মহাদেবের স্ত্রী, দুর্গা, কালী (শ্মশান কালী, ভদ্রকালী, রক্ষাকালী, শ্যামা ও চামুণ্ডা) গঙ্গা, সতী, পার্বতী প্রভৃতি। তার বাসস্থান— কৈলাশ পর্বত, শিবলোক, রজুতগিরি, হিমালয়, বিল্ব ও বটবৃক্ষ প্রভৃতি।

তার পুত্র— কার্তিক এবং গণেশ, কন্যা— লক্ষ্মী এবং সরস্বতী, দ্বাররক্ষক— নন্দী, ভৃঙ্গী এবং মহাকাল, সহচর— ভূতপ্রেত প্রভৃতি; অস্ত্র— ত্রিশুল, বাহণ— ষাঁড়। প্রিয় খাদ্য— গাঁজা এবং ভাং। তার পত্নীদের প্রায় সকলেরই সংক্ষিপ্ত পরিচয় পৃথকভাবে তুলে ধরা হয়েছে। অতএব তার পুত্রকন্যা প্রভৃতির পরিচয় নিম্নে পৃথক পৃথকভাবে তুলে ধরা যাচ্ছে :

কার্তিক, কার্তিকেয় : শিব বা মহাদেবের পুত্র। মহাদেব পার্বতীর সঙ্গে রমণকার্যে রত থাকার সময়ে হঠাৎ কতিপয় দেবতা তার নিকটে যান। সঙ্গে সঙ্গে তিনি উঠে পড়েন। ফলে বীর্য পতিত হয়। পৃথিবী তা ধরতে না পেরে অগ্নিতে নিক্ষেপ করেন। অগ্নি থেকে তা শরবনে নিক্ষিপ্ত হয়। এই বীর্য থেকে কার্তিকের উৎপত্তি। এ সময়ে তাঁকে কৃর্তিকাগণ লালন পালন করেন। সেই কারণে তাঁর নাম হয়— কার্তিক বা কার্তিকেয়।

তারকাসুরকে বধ করার পরে তার নাম হয়— তরকারি। কার্তিক দেব-সেনাপতি। মহাভারত, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, রামায়ণ, ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ প্রভৃতিতে কার্তিকের জন্ম সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ দেখতে পাওয়া যায়। — আশুতোষ দেবের নূতন বাঙ্গালা অভিধান : ১১৩৯ পৃঃ

গণেশ : ১. হর পার্বতীর জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি সর্বসিদ্ধিদাতা। মুষিক তার বাহন। ব্যাসদেবের মহাভারত রচনায় লিপিকার ছিল। তার মুখ গজাকৃতি হওয়া সম্পর্কে বিভিন্ন উপখ্যান প্রচলিত আছে। গণেশের জন্ম হলে সকল দেবতাই তাকে দেখতে আসে। কিন্তু শনির দৃষ্টিপাত মাত্রই

www.pathagar.com

গণেশের মস্তক দেহ থেকে খসে পড়ে। তখন বিষ্ণু সুদর্শনচক্রে একটি গজমুণ্ড কেটে এনে গণেশের স্কন্ধে যোজন করে। —ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ

২. শিব ও পার্বতী গণেশকে দ্বারী (দরওয়াজার পাহারাদার) রেখে রমন কর্মে রত হয়। এমন সময়ে পরশুরাম এসে উপস্থিত হলে গণেশের সাথে তার যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে গণেশের একটি দাঁত ভেঙ্গে যায়।

—ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ

৩. মহাদেবের হাসি থেকে এক কুমারের উদ্ভব হয়। ঐ কুমারের সৌন্দর্যে দেবতারা এবং উমাদেবীও মুগ্ধ হয়। উমাদেবীকে মুগ্ধ হতে দেখে মহাদেব ভীষণভাবে ক্রুদ্ধ হয় এবং কুমারকে অভিশাপ প্রদান করে। ফলে তার মুখমণ্ডল হস্তিমুখে পরিণত হয়। —বরাহ পুরাণ

লক্ষ্মী : ১. পিতা-দক্ষ, মাতা-প্রসূতি। প্রসূতির গর্ভে দক্ষের চব্বিশটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে। তন্মধ্যে শ্রদ্ধা, লক্ষ্মী প্রভৃতি ত্রয়োদশ কন্যাকে ধর্ম বিবাহ করে। খ্যাতি, সতি, সম্ভূতি প্রভৃতি একাদশ কন্যাকে যথাক্রমে ভৃগু, ভব, মরীচি, বহ্নি প্রভৃতি ও পিতৃগণ বিবাহ করে। ধর্মের ঔরসে লক্ষ্মীর দর্প নামক এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে।[১]

২. ভৃগু পত্নী খ্যাতির গর্ভে ধাতা-বিধাতা নামে দুই পুত্র এবং লক্ষ্মী নাম্নী কন্যার জন্ম হয়। এ ভৃগুকন্যা লক্ষ্মী দেব নারায়ণকে পতিরূপে গ্রহণ করে।[২]

৩. লক্ষ্মীর গর্ভে নারায়ণের বল ও উৎসাহ নামক দুই পুত্র জন্মে। যারা স্বর্গচারী ও যারা পুণ্যকর্মা ও দেবগণের বিমান বহণকারী তারা সকলেই লক্ষ্মী বা শ্রীদেবীর মানসপুত্র। —বায়ু পুরাণ

৪. লক্ষ্মী দত্তাত্রেয় ঋষির পত্নী। অসুর কর্তৃক লাঞ্ছিত দত্তাত্রেয়ের শরণাপন্ন হয় এবং লক্ষ্মীর রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে মস্তকে ধারণ করে। এই মস্তকে ধারণ করার ফলেই তারা অসুরদের ওপরে বিজয় লাভ করে। —মার্কণ্ডেয় পুরাণ ১৮-১৯ অধ্যায়

৫. লক্ষ্মী সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। বিষ্ণুর পত্নী পিতা মহর্ষি ভৃগু, মাতা খ্যাতি। দুর্বাসার অভিশাপে ত্রিলোক শ্রীহীন হলে তিনি সমুদ্রে নিমজ্জিতা হয় এবং পরে সমুদ্রমন্থনে উত্থিতা হয়।

---

১. বিষ্ণু পুরাণ ১/৭/১৪-২৬; পদ্ম পুরাণ, সৃষ্টি খণ্ড ৩/১৮৩; গরুড় পুরাণ ৫/১৪-২৩।

২. বিষ্ণু পুরাণ ১/৮/১৩, বায়ু পুরাণ ২৯/১-৪, কুর্ম পূর্বভাগ ১৩/১।

(লক্ষণীয় যে একই বিষ্ণু পুরাণের ৭ম অধ্যায়ে লক্ষ্মীকে দক্ষের কন্যা এবং ধর্মের পত্নী বলা হয়েছে। আবার পরবর্তী ৮ম অধ্যায়ে তাঁকে ভৃগুর কন্যা এবং নারায়ণের পত্নী বলা হয়েছে। — লেখক)

www.pathagar.com

৬. নারদীয়, ধর্ম এবং কূর্ম পুরাণের মতে লক্ষ্মী ও সরস্বতী শিব-দুর্গার কন্যা। বাংলাদেশে শরৎকালীন দুর্গা পূজার শিবদুর্গার কন্যা হিসেবেই এদের পূজা হয়।

সমুদ্রমন্থন সম্পর্কে বিভিন্ন পুরাণে ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ রয়েছে। তন্মধ্যে অধিকাংশের সমর্থিত বিবরণটি হলো :

দুর্বাসা মুণি ইন্দ্রের ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ প্রদান করে। ফলে ইন্দ্রসহ সকল দেবতা এবং গোটা ত্রিভুবন শ্রী বা লক্ষ্মীহীন হয়ে নিশ্চিত ধ্বংসকে অনিবার্য করে তোলে। সুযোগ বুঝে দৈত্য দেবতাদের আক্রমণ করে। দেবতারা পরাস্ত এবং স্বর্গচ্যুত হয়।

ব্রহ্মা বিপন্ন দেবতাদের সঙ্গে নিয়ে নারায়ণের কাছে গেলে সে সাহায্যের আশ্বাস প্রদান করে। এজন্যে সমুদ্রগর্ভ থেকে লক্ষ্মীর উদ্ধার এবং অমৃত আহরণের প্রয়োজন দেখা দেয়।

কিন্তু শ্রীহীন দেবতাদের একক প্রচেষ্টায় এ কাজ সম্ভব ছিল না। তাই নারায়ণ সুকৌশলে দৈত্যদেরও এ কাজে নিয়োজিত করে।

সমুদ্রমন্থনের জন্য মন্দার পর্বতকে মন্থনদণ্ড এবং স্বর্পরাজ বাসুকিকে রজ্জু হিসেবে ব্যবহার করা হয়। নারায়ণের চাতুর্যপূর্ণ ব্যবস্থাপনার ফলে দেবতারা বাসুকির পুচ্ছভাগে এবং দৈত্যরা সম্মুখভাগে স্থান লাভ করে। ফলে বাসুকির নিঃশ্বাস প্রভাবে দৈত্যরা হতশ্রী ও দুর্বল হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে দেবতারা শক্তিশালী হতে থাকে।

মন্থনকালে বাসুকির মুখ থেকে অমৃত নিসৃত হতে থাকলে ধন্বন্তরী তার স্বীয় কমণ্ডলুতে ধারণ করে এবং উক্ত কমণ্ডলুসহ মন্থনদণ্ড সমীপে আগমণ করে।

দৈত্যরা বলপূর্বক কমণ্ডলুটি কেড়ে নেয়। অতঃপর অমৃত পানে দৈত্যরা অমর এবং অজেয় হয়ে উঠবে একথা চিন্তা করে দেবতারা ভীষণভাবে হতাশাগ্রস্ত ও বেদনার্ত হয়ে পড়ে।

এই অবস্থায় নারায়ণ এক মোহিনী নারীর মূর্তি ধারণ করে ছুটতে থাকে; দৈত্যরা মোহাবিষ্ট হয়ে তার পশ্চাদ্ধাবন করে। সুযোগ বুঝে নারীরূপী নারায়ণ অমৃতপূর্ণ কমণ্ডলুটি হস্তগত করে দেবতাদের মধ্যে পাচার করে।

ইতোমধ্যে সমুদ্র (ক্ষীরোদ সাগর) গর্ভ থেকে লক্ষ্মীকে উদ্ধার করা হয়। লক্ষ্মী নারায়ণের স্ত্রীরূপে তার বক্ষস্থলে স্থান লাভ করে ইত্যাদি।

— পদ্ম পুরাণ, ৪র্থ অঃ, ২৮-৩০ পৃঃ

নন্দী : শিবের প্রধান অনুচর ও দ্বারপাল। শালঙ্কায়ন মুণির দক্ষিণ অঙ্গ থেকে উৎপন্ন। দধীচি মুণি তার গুরু। দক্ষযজ্ঞ কালে শিবনিন্দা করে তারই অভিশাপে দক্ষ ছাগবদন হয়। গুরুর বরে শিবের পার্শ্বচররূপে গৃহীত।

— স্কন্দ ও কূর্ম পুরাণ

www.pathagar.com

ভৃঙ্গী ও মহাকাল : ভৃঙ্গী এবং মহাকালকে দ্বাররক্ষার দায়িত্বে রেখে হর এবং পার্বতী (মহাদেব এবং দুর্গা— লেখক) রমণকার্য শুরু করে। রমণ শেষে রমণাসক্ত অবস্থাই স্খলিত বস্ত্র হস্তে ধারণ করে পার্বতী হঠাৎ বাইরে আসে, ফলে দ্বাররক্ষক ভৃঙ্গী ও মহাকালের নযরে পড়ে যায় এবং অভিশাপ দেয় যে, তারা উভয়ে বানরের মুখাকৃতি নিয়ে মনুষ্য যোনিতে জন্মগ্রহণ করবে। — কালিকা পুরাণ

মনসা : ১। কশ্যপ মুণির মানসী কন্যা। বাসুকীর ভগিনী ও অস্তিকের মাতা। মনুষ্যগণের মনে ক্রীড়া করে বলে তার নাম মনসা দেবী। — মহাভারত

জরুৎকার মুণির ন্যায় তার দেহ ক্ষীণ ছিল বিধায় শ্রীকৃষ্ণ তার নাম রাখেন জরুৎকারু। জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে নাগদের জীবনরক্ষা করেছিল বলে নাগেশ্বরী নামেও পরিচিতা। — দেবী ভাগবত

২। মনসার অপর নাম জরৎকারু। জরুৎকারু নামে এক মুণিও ছিল। সে মনসাকে বিবাহ করেন। — মহাভারত

যম : ধর্মরাজ। পিতা-সূর্য, মাতা-সংজ্ঞা। দক্ষিণ দিকের অধিপতি। জীবের পাপ-পুণ্যের ফল দানকারী। তার বাহন— মহিষ, অস্ত্র— দণ্ড বা গদা। বিদুর রূপে (অম্বালিকার দাসীর গর্ভে বেদব্যাস মুণির ঔরসে) জন্মগ্রহণ করে। দক্ষ প্রজাপতির শ্রদ্ধা, মৈত্রী, দয়া, শান্তি, তুষ্টি, ক্রিয়া, মূর্তি প্রভৃতি ত্রয়োদশ কন্যাকে বিবাহ করে এবং তাদের গর্ভে, তার সত্য, প্রসাদ, অভয়, শম, হর্ষ, গর্ব, নর ও নারায়ণ এ কয়টি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। কুন্তীর গর্ভে যুধিষ্ঠিরের জন্ম দান করে।

— আশুতোষ দেবের নূতন বাঙ্গালা অভিধান : ১২৬৭

দেবদেবীদের পরিচিতির তালিকা আর দীর্ঘায়িত করতে চাই না। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, দেবদেবীদের মোট সংখ্যা তেত্রিশ কোটি। তন্মধ্যে প্রায় তিন শতের নাম ও পরিচয় পাওয়া যায়। এ তিন শতের মধ্যে যাদের পূজার্চনা প্রচলিত রয়েছে তাদের সংখ্যা প্রায় একশত। সুতরাং এ পুস্তকের ক্ষুদ্র পরিসর পরিচিতদের তো নয়-ই এমনকি সম্পুজিত প্রায় একশত দেবদেবীর পরিচয় তুলে ধরাও কোনও ক্রমেই সম্ভব হতে পারে না। যারা তাদের পরিচয় জানতে আগ্রহী তাদের বিভিন্ন পুরাণ, উপপুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, দেবীভাগবত, চণ্ডী প্রভৃতি গ্রন্থসমূহ পাঠ করার অনুরোধ জানাচ্ছি।

www.pathagar.com

ওপরের এ কতিপয়ের পরিচিতি থেকেই সুস্পষ্টরূপে বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, মানুষের মতো দেবদেবীদের মধ্যেও আকৃতি-প্রকৃতি, জন্ম-জীবনযাত্রা, স্বভাব-চরিত্র, খাদ্যাখাদ্য প্রভৃতির দিক দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী রয়েছে। আলোচনার সুবিধার জন্যে শ্রেণী হিসেবে তাদের পরিচয় তুলে ধরা প্রয়োজন বিধায় পুরাণ ভাগবতাদি গ্রন্থের বিবরণ অবলম্বনে সংক্ষিপ্তভাবে তাদের শ্রেণীবিভাগ করা যাচ্ছে :

দেবদেবীদের শ্রেণীবিভাগ

০ **কাশীতে**— বিশ্বনাথ, **গয়ায়**— গয়াসূর, **বৈকুণ্ঠে**— শ্রীকৃষ্ণ, **স্বর্গে**— দেবগণ, **পাতালে** — বাসুকী, **ব্রজে**— ব্রজের গোপাল, **মথুরায়** — রাধাকৃষ্ণ, **নাগলোকে**— সর্পগণ, **কামাখ্যায়** — সতীর সীতা (স্ত্রীঅঙ্গ), **জলে** — বরুণ, **বাতাসে**— পবন-দেব, **কালীঘাটে** — কালীমাতা, **পুরীতে** — জগন্নাথ, **বিল্ব-বৃক্ষে**— শিব-পার্বতী, **বটগাছে** — মহাদেব, **অশ্বত্থগাছে** — দুর্গাদেবী, **কদমগাছে** — কৃষ্ণঠাকুর ইত্যাদি। এরা স্থানীয় দেবতা।

০ **শ্রীকৃষ্ণ** — রাধা, লক্ষ্মী, সরস্বতী ছাড়াও ষোড়শ শত গোপিনীর সাথে প্রেম করেন। **মহাদেব**— সতীর সাথে প্রেম করতে গিয়ে পাগল হন, গঙ্গার সাথে প্রেম করে দুর্গার অভিশাপ ভোগ করেন, হিমালয় কন্যা পার্বতীর প্রেমে দিশাহারা হন; **নারায়ণ**— তুলসীর সাথে প্রেম করে শীলায় পরিণত হন, **দেবরাজ ইন্দ্র** — অহল্যার সাথে প্রেম করার পরিণামে তাঁর সারাদেহে সহস্র যোনির উদ্ভব ঘটে, **শিব** — ঋষিপত্নীদের সাথে প্রেম করতে গিয়ে লিঙ্গপাত হয়; **জগাই-মাধাই**— কৃষ্ণ-প্রেমে সংসার ত্যাগী হয়, **নিমাই** — হরি-প্রেমে বৈরাগ্য বরণ করেন, **তিলোত্তমা-উর্বশী-মেনকা-রতি-রম্ভা**— প্রভৃতি স্বর্গ বেশ্যারা যত্র-তত্র প্রেম বিতরণ করেন, **মদন**— প্রেমের রাজা, **রতি**— প্রেমের রাণী ইত্যাদি– এরা প্রেমের দেবতা।

০ **মহাদেব**— ক্রোধপরায়ণ হয়ে প্রস্রাব করে শ্বশুরের যজ্ঞ ভাসিয়ে দেন, **ভৃগু**— ক্রোধের বশে ভগবানের বক্ষে পদাঘাত করেন, **পরশুরাম**— কুঠারাঘাতে এক বিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রীয় করেন, **গৌতম**— ক্রোধের বশে অহল্যাকে পাষাণে পরিণত করেন ও দেবরাজ ইন্দ্রের দেহে সহস্র যোনির উদ্ভব ঘটান, **দুর্বাশা**— অভিশাপ দিয়ে রাজা হরিশ চন্দ্রকে চণ্ডালে পরিণত করেন, **চামুণ্ডা**— ক্রোধের বশে নিজের মুণ্ডপাত ঘটান, **জহ্নুমুণি**— ক্রোধান্ধ হয়ে গোটা গঙ্গানদীকে গ্রাস করেন ইত্যাদি। এরা হলেন ক্রোধের দেবতা।

www.pathagar.com

০ **সাপের ভয়ে**— মনসা পূজা, **জ্বরে** — জরাসুরের পূজা, **চুলকানি-পাঁচড়ায়** — ইটেকুমারের পূজা, **যক্ষ্মায়** — রক্ষাকালীর পূজা, **কলেরা-বসন্তে** — শীতলার পূজা, **দুর্গতির ভয়ে** — দুর্গাপূজা, **শত্রুর ভয়ে**— কার্তিক পূজা, **ব্যবসায়ে লোকসানের ভয়ে**— গণেশের পূজা, **ঝরে নৌকা ডুবির ভয়ে** — গঙ্গাপূজা ইত্যাদি। এরা ভয়ের দেবতা।

০ **মহাদেব**— গাঁজা-ভাং ভালো বাসেন, **মদন গোপাল**— নাড়ু সন্দেশে খুশি হন, **সত্যনারায়ণ**— সিন্নি খাওয়ার অভিলাষী, **ডাকিনী-যোগিনী**— রক্তের পিয়াসী, **শনিঠাকুর**— বাতাসায় তুষ্ট, **গণেশ** — তুষ্ট চাল-কলায়, **দুর্গা** — পরমান্ন ভালোবাসেন, **ত্রিনাথ**— ভাং ঘোটায় প্রীত হন, **দেবরাজ ইন্দ্র**— সোমরস ভালোবাসেন, **ননী গোপাল**— ননীমাখন চুরি করেন ইত্যাদি। এরা লোভের দেবতা।

০ **মহাদেবের অস্ত্র**— ত্রিশুল, পিনাক ও পাশুপত, **শ্রীকৃষ্ণের অস্ত্র** — সুদর্শন চক্র, **বলরামের অস্ত্র**— লাঙ্গল, **পরশুরামের অস্ত্র** — কুঠার, **শ্রী রামের অস্ত্র** — তীর, ধনুক, **নারায়ণের অস্ত্র**— শঙ্খ চক্র, গদা ও পদ্ম, **কার্তিকের অস্ত্র**— ধনুর্বাণ, **ইন্দ্রের অস্ত্র** — বজ্র, **মা দুর্গার অস্ত্র**— খড়গ, কুঠার প্রকৃতি দশ প্রহরণ, **ভীমের অস্ত্র**— গদা, **মনসার অস্ত্র**— সর্প ইত্যাদি। এরা সশস্ত্র দেবতা।

০ **ইন্দ্রের বাহন**—ঐরাবত হস্তি, **শ্রীকৃষ্ণের** — গড়ুর পাখি, **কার্তিকের**— ময়ূর, **লক্ষ্মীর**— পেঁচা, **গণেশের** — ইঁদুর, **স্বরস্বতীর**— হাঁস, **মহাদেবের**— বলদ, **দুর্গার** — সিংহ, **যমরাজের** — কুকুর, **মনসার** — সর্প, **শীতলার**— গাধা, **গঙ্গার** — মকর, **বিশ্বকর্মার**— ঢেঁকি ইত্যাদি। এরা বাহন দেবতা।

০ **চন্দ্রের** — যক্ষ্মাব্যাধি, **শুক্রাচার্যের**— এক চোখ কানা, **গণেশের** — হস্তি মুণ্ড, **ইন্দ্রের**— সহস্র যোনি, **অহল্যার**— পাষাণ মূর্তি, **জটাসুরের**— মাথায় জট, **নারায়ণ**— গোল পাথর, **ব্রহ্মার** — চারটি মুখ, **মহাদেব**— পঞ্চমুখী, **শ্রীদুর্গার**— দশ হাত, **জগন্নাথের** — হাত-পা ঠুঁটো, **গণপতির**— পেট মোটা, **চামুণ্ডার**— হাতে মুণ্ড, **ব্রহ্মা**— রক্তবর্ণ, **কালীর**— বর্ণ কালো, **শ্রীকৃষ্ণ**— শ্যামসুন্দর, **মহাদেবের**— বর্ণ সাদা, **অস্ট্রাবক্র মুণির**— আট স্থানে বাঁকা ইত্যাদি। এরা রুগ্ন ও বিকলাঙ্গ দেবতা।

০ **লক্ষ্মী**— বীণা বাজাতে ভালোবাসেন, **শ্রীকৃষ্ণ**— বাজান মোহন বাঁশি, **মহাদেব**— ডমরু বাজান, **নারদ**— বাজান একতারা, **জগাই-মাধাই**— খোল-করতাল বাজান, **মহাদেব**— শঙ্খনাদে তুষ্ট হন, **দুর্গা** — ঢাকের বাদ্য ভালোবাসেন ইত্যাদি। এরা বাদ্যযন্ত্রপ্রিয় দেবতা।

www.pathagar.com

স্থানাভাববশত এ শ্রেণীবিভাগ পর্ব এখানেই শেষ করতে হলো। অন্য দেবদেবীদের পরিচয়ও যে এ থেকে ভিন্ন নয় আশা করি সেকথা খুলে বলার প্রয়োজন হবে না।

ভক্ত-ভাবুকদের কথা স্বতন্ত্র, অতিভক্ত অন্ধভক্তদের কথা আরো স্বতন্ত্র, কেননা কোনও কিছুকে যাঁচাই-বাছাই করার সাধ্যশক্তি তাদের থাকে না এবং তেমন প্রয়োজনীয়তাও তাঁরা বোধ করেন না। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থার মানুষ যারা কোনও কিছুকে না জানা পর্যন্ত তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন সম্ভব নয় বলে মনে করেন এবং "যাকে যত বেশি করে জানা যায় তার প্রতি বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের মাত্রাও তত বেশি এবং তত দৃঢ় হয়ে থাকে এ-বাস্তব ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা যাদের রয়েছে তারা পুরাণভাগবতাদি গ্রন্থের এসব বিবরণকে কোনওক্রমেই সত্য, স্বাভাবিক এবং বিশ্বাসযোগ্য বলে মেনে নিতে পারেন না।

কেউ কেউ এসব বিবরণকে অতীব অশ্লীল, জঘন্য এবং মানবতাবিরোধী বলেও মন্তব্য করতে পারেন। অথচ এমনটা হওয়ার কথা ছিল না। কেননা, যারা সৃষ্টির সেরা মানুষের উপাস্য এবং ভক্তিশ্রদ্ধার পাত্র হবেন তাদের চরিত্র এবং কার্যকলাপ অতি অবশ্যই আদর্শ এবং অনুকরণীয় হতে হবে।

একটি পর্যালোচনা

'দেবদেবী এবং দেবতা শব্দের তাৎপর্য' শীর্ষক নিবন্ধের শেষে 'ব্যাকরণের মতে দেব ও দেবতার সংজ্ঞা' সম্পর্কীয় আলোচনা থেকে আমরা দেবদেবী ও দেবতা শব্দের মোটামুটি তাৎপর্য বুঝতে পেরেছি। সেখানে ব্যাকরণের যে সূত্রটি উদ্ধৃত করা হয়েছে তাহলো "দেবো দানাদ্ বা দীপনাদ্ বা দ্যোতমদ বা দ্যুস্থানো ভবতীবা।"

অর্থাৎ— যে দান করে সে দেব, যে দীপ্ত বা দ্যোতি সে দেবতা এবং যে দ্যুস্থানে থাকে তিনিও দেবতা। এ হিসেবে সূর্য, চন্দ্র পবন, বরুণ প্রভৃতিরা সকলেই দেবতা। কেননা এরা যথাক্রমে বিশ্ববাসীকে তাপ, কিরণ, বায়ু এবং পানি দান করে চলেছে।

দীপ্ত বা দ্যোতিত হওয়ার কারণে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, অগ্নি প্রভৃতিরাও দেবতা।

আর দ্যুস্থানে থাকার কারণে সূর্য, সবিতা, বিষ্ণু, মিত্র, পূষা প্রভৃতিরা যে দেবতা বেদের শ্লোক থেকেই সে তথ্য আমরা জানতে পেরেছি।

www.pathagar.com

এ দিক দিয়ে বিচার-বিবেচনা করা হলে বৈদিক ঋষিদের দেবতা নির্বাচন ঠিকই রয়েছে বলতে হবে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, পুরাণ-ভাগবতাদি গ্রন্থে দুর্গা, লক্ষ্মী, শনি, সুবচনী প্রভৃতি নামে যে শত শত দেবদেবীর নাম ও পরিচয় লিপিবদ্ধ রয়েছে তাদের দেবতা হওয়া সম্পর্কে ব্যাকরণের কোনও সূত্র আছে কি না?

আমার জানামতে তেমন কোনও সূত্র নেই। তবে এ সম্পর্কে কতিপয় ধর্মগ্রন্থ এবং প্রখ্যাত পণ্ডিতমণ্ডলীর প্রায় সর্বসম্মত অভিমত হলো :

বিশ্ব সৃষ্টির মূলে সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই তিনটি গুণ বিদ্যমান। বিভিন্ন অভিধানে এ তিনটি গুণের যে পরিচয় লিখিত রয়েছে তার সারসংক্ষেপ হলো :

সত্ত্ব— প্রকৃতির তিন গুণের মধ্যে প্রধান গুণ। এ গুণ দ্বারা মানুষের মনে দয়া, ধর্ম, ন্যায়, সত্য, ভক্তি, মহত্ত্ব ও পবিত্রতাদি সৃষ্টি হয়।

রজ— (রজস) ধূলা, পুষ্পরেণু, পরাগ, দ্বেষ, রাগ, অহংকারাদির কারণ গুণ।

তম— (তমস) তমোগুণ, মোহ, অন্ধকার, পাপ প্রভৃতি।

বলাবাহুল্য, বিশ্ব সৃষ্টির মতো এমন একটি বিরাট ব্যাপার নিয়ে আলোচনায় ব্রতী হওয়ার প্রয়োজন এখানে নেই। আমরা যথাক্রমে শুধু দেবতা, মানুষ এবং অসূর বা দৈত্য দানবাদি এ তিন শ্রেণীর মধ্যে ওপরোক্ত গুণত্রয়ের কোনটির বা কোন কোনটির কি পরিমাণ রয়েছে সেকথা জানার চেষ্টা করবো।

উল্লিখিত ধর্মগ্রন্থসমূহ এবং হিন্দু-পণ্ডিতমণ্ডলীর এ সম্পর্কীয় অভিমত হলো :

০ একমাত্র দেবতারাই সত্ত্বগুণের অধিকারী। অতএব তাদের দ্বারা সামান্যতম পাপও অনুষ্ঠিত হতে পারে না। অর্থাৎ পাপপ্রবণতা বলতে কোনও কিছুর অস্তিত্বই তাদের মধ্যে নেই।

০ মানুষ ওপরোক্ত তিনটি গুণেরই অধিকারী। অতএব মানুষের দ্বারা শুধু পুণ্য, শুধু পাপ এবং পাপ পুণ্য উভয়টা-ই অনুষ্ঠিত হতে পারে।

০ অসূর বা দৈত্য-দানবদের মধ্যে একমাত্র তমঃগুণ বিদ্যমান। অতএব শুধু পাপ কাজই তারা করতে পারে। অর্থাৎ দেবতাদের মধ্যে যেমন পাপ প্রবণতা বলতে কিছু নেই, অসূর বা দৈত্য-দানবদের মধ্যেও তেমনি পুণ্য প্রবণতা বলতে কিছু নেই; একটি অন্যটির বিপরীত।

বলাবাহুল্য, মানুষ বা দৈত্য-দানব এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। তথাপি দেবতাদের মর্যাদা ও গুরুত্বকে বোঝানোর জন্য তাদের প্রসঙ্গকে টেনে আনতে হলো।

এবারে আসুন, ব্যাকরণের সূত্র এবং ধর্মগ্রন্থের আলোকে দেবতা বলতে কি বোঝায় নতুন করে সেকথা আবার ভেবে দেখি :

০ যিনি দান করেন তিনি দেবতা।

www.pathagar.com

০ যিনি দীপ্ত বা দ্যোতিত হন তিনি দেবতা।

০ যিনি দ্যুস্থানে (অন্তরিক্ষে) থাকেন তিনি দেবতা।

০ যিনি বা যারা একমাত্র সত্ত্বগুণের অধিকারী এবং সম্পূর্ণরূপে নিষ্পাপ ও নিষ্কলংক— তিনি বা তারা দেবতা।

এ পটভূমিতে বিচার করা হলে ইতোপূর্বে পুরাণ-ভাগবতাদির আলোকে দেবদেবীদের উদ্ভব, কার্যকলাপ ও চরিত্রের যে পরিচয় পাওয়া গিয়েছে তা থেকে অতীব দুঃখ এবং অপরিসীম বেদনার সাথে বলতে হয় যে, ভগবান ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেব থেকে শুরু করে এমন একজন দেবদেবীও খুঁজে পাওয়া যাবে না যিনি দেবতা পদবাচ্য হতে পারেন।

অথচা এমনটা হওয়ার কথা ছিল না। ভগবান ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেব ও ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি প্রখ্যাত দেবতাবৃন্দের সকলেই পুরাণ ভাগবতাদির বর্ণনানুযায়ী চরিত্রহীন, নারীর সতীত্ব হরণকারী, অভিশপ্ত বলে প্রমাণিত হচ্ছেন একথা ভাবতেও মন দুঃখ ও হতাশায় ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে।

এ থেকে দুটি সিদ্ধান্তের যে কোনও একটিকে গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। তার একটি হলো ঃ পুরাণ-ভাগবতাদির এসব বিবরণ যদি সত্য হয় তবে দেবদেবী বলে যারা পরিচিত ও সম্পূজিত হয়ে আসছেন তাদের একজনও দেবদেবী পদবাচ্য হতে পারেন না।

আর এরা যদি প্রকৃতই দেবদেবী হন তাহলে পুরাণ, ভাগবতাদি গ্রন্থের বিবরণ সত্য হতে পারে না। বলাবাহুল্য, আমাদের দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটিকেই গ্রহণ করতে হয়। কেন না, ভগবান ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেব এবং বরুণাদি প্রখ্যাত দেবতাবৃন্দ উচ্ছৃংখল, চরিত্রহীন, নারীর সতীত্ব হরণকারী প্রভৃতি হতে পারেন কোনওক্রমেই একথা আমরা বিশ্বাস করতে পারি না।

তবে অতীব দুঃখের সাথে বলতে হয় যে, আমরা বা অন্য কেউ বিশ্বাস করতে না পারলেও অন্তত এদেশে বিশ্বাস করার লোক যথেষ্টই রয়েছেন এবং তাঁদের মধ্যে জ্ঞানী-গুণী বলে সুপরিচিত লোকদের সংখ্যাও মোটেই কম নয়।

'অন্য কেউ' এবং 'এ দেশে' বলার কারণ : অতীতে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের মানুষই সেই সব দেশের দেবদেবীদের এমনি ধরনের অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য, প্রকৃত সত্যের বিপরীত এবং অশালীন জন্ম বৃত্তান্ত ও চরিত কথায় বিশ্বাস পোষণ করতেন। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-সভ্যতার উন্নতির সাথে সাথে তারা সেই বিশ্বাস থেকে মুক্তি লাভ করেছেন। এ দেশের এক শ্রেণীর মানুষ আজও তা পারেন নি এই যা তফাৎ।

www.pathagar.com

সে যা হোক, এ আলোচনা থেকে এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, দেবদেবীদের সম্পর্কে ব্যাকরণের সূত্র, বিশ্বস্ত ধর্ম গ্রন্থসমূহ, প্রখ্যাত মণীষীবৃন্দ এবং মানুষের স্বাভাবিক বিবেক-বুদ্ধির রায় একটি-ই। আর তা হলো— দেব-দেবীরা অর্থাৎ— প্রকৃতই যারা দেবদেবী তারা সকলেই সত্ত্বগুণ বিশিষ্ট এবং নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্ক।

বলাবাহুল্য, যারা আসল বা প্রকৃত দেবদেবী নয় তাদের কথা স্বতন্ত্র এবং আমাদের কথিত দেবদেবীদের সাথে তাদের সামান্যতম সম্পর্কও নেই— থাকতে পারে না।

এখানে কেউ হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন যে, যারা দেবদেবীই নয় তাদের আবির্ভাব ঘটলো কি করে আর কিভাবেইবা তারা আসল দেবদেবীদের শামিল হতে পারলো?

পরবর্তী আলোচনায় সুযোগ বুঝে এ প্রশ্নের উত্তর দেয়া হবে। এখানে অন্য যে প্রশ্নটির উত্তর দেয়া খুবই প্রয়োজন তা হলো— ব্যাকরণের সূত্র, বিশ্বস্ত ধর্মগ্রন্থসমূহ। প্রখ্যাত মনীষীবৃন্দ এবং মানুষের স্বাভাবিক বিবেক-বুদ্ধি যেখানে দেবদেবীদের সত্ত্বগুণ বিশিষ্ট এবং নিষ্পাপ ও নিষ্কলংক বলে সুস্পষ্ট রায় দেয় সেখানে পুরাণ-ভাগবতাদি গ্রন্থে পাইকারীভাবে সকল দেবদেবীর জন্ম, জীবনযাত্রা, আকৃতি প্রকৃতি, কার্যকলাপ প্রভৃতি সম্পর্কে এমন অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য এবং প্রকৃত সত্যের বিরোধী কাহিনীসমূহ কিভাবে স্থান পেলো? আর এ স্থান দানের কাজটা সাধিত হয়েছে কার বা কাদের দ্বারা?

এ প্রশ্নের উত্তর খুবই সহজ এবং সরল। কেননা বর্ণ-ব্যবস্থা শুরু হওয়া থেকে আলোচ্য সময় পর্যন্ত হাজার হাজার বছর ধর্মীয় গ্রন্থসমূহের প্রণয়ন, সংরক্ষণ এবং ধর্মীয় কার্যকলাপের পরিচালনার দায়িত্ব এককভাবে ব্রাহ্মণদের ওপরই অর্পিত হয়েছিল। এতে অন্য কারো নাক গলানোর সামান্যতম অধিকারও যে ছিল না এ আলোচনায় অংশগ্রহণকারী মাত্রেরই সেকথা জানা রয়েছে।

বেদ ও উপনিষদের মতে দেবতার সংখ্যা যে মাত্র তেত্রিশ জন, 'বেদের দেবতা' শীর্ষক নিবন্ধ থেকে তার নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রমাণাদি আমরা পেয়েছি। পরবর্তী সময়ে পুরাণের মাধ্যমে এ সংখ্যা বৃদ্ধি করে দেবদেবীদের সংখ্যা যে তেত্রিশ কোটিতে উন্নীত করা হয়েছে 'পুরাণের দেবতা' শীর্ষক নিবন্ধ থেকে সেকথাও আমাদের জানা হয়েছে।

এ সংখ্যা বৃদ্ধি এবং এসব দেবদেবীর জন্ম, আকৃতি-প্রকৃতি, জীবনযাত্রা প্রভৃতি সম্পর্কে অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য, অশালীন এবং প্রত্যক্ষ সত্যের বিরোধী কাহিনীর রচনা ও প্রচারণা যে ব্রাহ্মণদের দ্বারাই অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেকথা খুলে বলার প্রয়োজন হয় না।

www.pathagar.com

এখানে পুনরায় প্রশ্ন দেখা দেয় যে, দেবদেবীদের এরূপ অদ্ভুত, অযৌক্তিক, প্রত্যক্ষ সত্যের বিপরীত জন্মবৃত্তান্ত এবং অশালীন ও অবিশ্বাস্য কার্যকলাপের বিবরণ পুরাণ-ভাগবতাদি গ্রন্থের প্রণেতা ব্রাহ্মণরা কিভাবে ও কোন সূত্র থেকে সংগ্রহ করেছিলেন এবং সেগুলোকে ওপরোক্ত গ্রন্থাবলীর মাধ্যমে সংরক্ষিত করাইবা কি প্রয়োজন ছিল?

অন্যত্র এ সূত্রসমূহের কথা বলা হয়েছে। এ সূত্রসমূহ যে ভীষণভাবে দুর্বল এবং অনির্ভরযোগ্য তথ্য-প্রমাণাদি সহকারে সেকথা সেখানে তুলে ধরা হয়েছে।

তবে এ অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য, প্রত্যক্ষ সত্যের বিপরীত এবং শালীনতা বিবর্জিত কাহিনীসমূহ কেন ধর্মগ্রন্থের মাধ্যমে সংরক্ষিত করা হয়েছিল সেই প্রশ্নের উত্তর অবশ্যই তুলে ধরা প্রয়োজন।

পূর্ববর্তী আলোচনার মধ্যেই এ প্রশ্নের অনেকখানি উত্তর নিহিত রয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে : আলোচ্য সময়ে ব্রাহ্মণরা ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য তথা বাহুবল ও ধনবলে প্রভূত শক্তিশালী এবং সমাজের বুকে সুপ্রতিষ্ঠিত দুটি জাতির মোকাবিলায় নিজদের প্রতিষ্ঠিত করার কাজে লিপ্ত ছিলেন।

সেখানে একথাও বলা হয়েছে যে, এজন্য নিজেদের চরিত্রবল বা নৈতিক শক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করাই ছিল উদ্দেশ্য সাধনের সুপরীক্ষিত একমাত্র পথ। কিন্তু ব্রাহ্মণরা সেপথে না গিয়ে ভিন্ন পথ অবলম্বন করেছিলেন।

এ পথে চলতে গিয়ে প্রাথমিক পর্যায়ে তাঁরা জনমনে এ বিশ্বাসকেই বদ্ধমূল করে তুলতে চেয়েছিলেন যে, ব্রাহ্মণরাই ভগবানের একমাত্র প্রিয় পাত্র এবং তাদেরই তিনি শ্রেষ্ঠতম জাতি হিসেবে সৃষ্টি করেছেন।

এমনকি জন্মমাত্রই ব্রাহ্মণরা শুধু যে দেবতামণ্ডলীই নয় বরং স্বয়ং ভগবানেরও পূজ্য হয়ে থাকেন ধর্মগ্রন্থের উদ্ধৃতি সহকারে সে-তথ্যও সেখানে তুলে ধরা হয়েছে।

এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, স্বৈরাচারী শক্তিসমূহ চিরদিনই ওপর থেকে শক্তি বলে জনগণের ওপর স্বীয় প্রভুত্বের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে থাকে। জনগণের মনের সাথে তাদের বিশেষ কোনও সম্পর্ক থাকে না; শক্তি, মদ-মত্ততার জন্য তেমন প্রয়োজনও তারা অনুভব করেন না। বলাবাহুল্য, আমাদের কথিত বাহুবল এবং ধনবলের অধিকারী তথা ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যরাও সে প্রয়োজন অনুভব করেননি।

পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণরা নিজেদের অলৌকিক ও অতিমানবিক শক্তির অধিকারী, ভগবান ও দেবদেবীবৃন্দের একমাত্র প্রিয় ও পূজ্য, ভগবান ও দেবদেবীবৃন্দ এবং সাধারণ মানুষদের মধ্যে একমাত্র সেতুবন্ধ হিসেবে উপস্থাপিত করে জনগণের মনের গহীনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে চেয়েছিলেন।

www.pathagar.com

এ-কাজের দ্বিতীয় পর্যায়ে তাঁরা সাধারণ মানুষের মনমগজে এমন একটা ধারণা সৃষ্টির প্রয়াস পান যে, মানুষের জন্ম-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ, উত্থান-পতন, লাভ-ক্ষতি, জয়-পরাজয়, বিপদ-আপদ, মুক্তি-কল্যাণ, জরা-ব্যাধি, নিরাপময়-নিরাপত্তা প্রভৃতি এবং যাবতীয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ-দুর্বিপাকাদি এক একটি অশরীরি শক্তি বা দেবদেবীর সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির ওপরেই একান্তভাবে নির্ভরশীল। আর একমাত্র ব্রাহ্মণরাই এ দেবদেবীদের পরিচয় এবং তাদের সন্তুষ্টি বিধান ও ক্রোধ প্রশমনের পথ-পদ্ধতি ও উপায়-উপকরণাদি সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন।

তাছাড়া জনসাধারণের পক্ষ থেকে ভগবান এবং দেবদেবীদের উদ্দেশ্যে যাবতীয় আবেদন-নিবেদন ও পূজা-প্রার্থনাদি অনুষ্ঠানের যোগ্যতা এবং অধিকারও যে একমাত্র ব্রাহ্মণদেরই রয়েছে এমন একটা ধারণাও জনমনে সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা তাঁরা নানাভাবে করেছিলেন বলে প্রমাণ রয়েছে।

নিজেদের প্রাধান্য, যোগ্যতা ও অলৌকিক-অতিমানবিক শক্তির অধিকারী হওয়া এবং ভগবান ও দেবদেবীদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকার কথা প্রমাণ করার উদ্দেশ্যেই যে, ব্রাহ্মণরা ভগবান ও দেবদেবীদের জন্ম জীবনযাত্রা এবং কার্যকলাপাদি সম্পর্কে এসব অদ্ভুত ও চমকপ্রদ কাহিনী রচনা করেছিলেন একটু অভিনিবেশ সহকারে পুরাণ-ভাগবতাদি গ্রন্থ পাঠ করলেই সেকথা বুঝতে পারা যায়।

উদাহরণস্বরূপ নিজ পুত্র গণেশ এবং অনুচর ভৃঙ্গী ও মহাকালকে দরওয়াজায় পাহারা রেখে ভগবান মহাদেব কর্তৃক তদীয় পত্নী দুর্গা বা পার্বতীর সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হওয়া, অকস্মাৎ সেখানে ভগবান পরশুরাম ও কতিপয় দেবতার উপস্থিতি এবং সঙ্গম শেষে স্খলিত বস্ত্র হস্তে ধারণ করে উলঙ্গ অথবা অর্ধোলঙ্গ অবস্থায় বাইরে এসে পার্বতীর ভৃঙ্গী ও মহাকালের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার বিবরণসমূহকে স্মরণ করা যেতে পারে।

এহেন ঘটনা যে, আদৌ সত্য এবং বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে না সেকথা বলাই বাহুল্য। তথাপি এ ঘটনাকে সত্য বলে ধরে নিলেও প্রশ্ন থেকে যায় যে, নিঃসন্দেহে ঘটনাটি ছিল অতীব গোপনীয় এবং লজ্জাজনক, কোনও তৃতীয় পক্ষের সেখানে উপস্থিতি সম্ভবই ছিল না। তাছাড়া ঘটনাটি ঘটেছিল সুদূরের সেই কৈলাশ পর্বত বা স্বর্গলোকে অবস্থিত মহাদেবের নিজস্ব পুরীর নিভৃত কক্ষে।

মর্তের ব্রাহ্মণরা সুদূরের সেই কৈলাশ পর্বত অথবা স্বর্গলোকে অবস্থিত সেই নিভৃত কক্ষটিরও খবর রাখেন একথা প্রমাণ করাই যে এ কাহিনী রচনার উদ্দেশ্য সেকথা বুঝতে অনেক বিদ্যা-বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না।

www.pathagar.com

এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, পৃথিবীর প্রাচীন ইতিহাসে ব্রাহ্মণদের এ কার্যকলাপের সমর্থন রয়েছে। পৃথিবীর প্রাচীন ইতিহাস নিয়ে পর্যালোচনা করেছেন এমন ব্যক্তিমাত্রই জানেন যে, সুদূর অতীতে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই এমন একটা ধারণা গড়ে উঠেছিল অথবা গড়ে তোলা হয়েছিল যে ধর্ম বলতেই অদ্ভুত, অলৌকিক, অস্বাভাবিক ও চমকপ্রদ কার্যকলাপ বোঝায়। অর্থাৎ যা অদ্ভুত, অলৌকিক, অস্বাভাবিক এবং চমকপ্রদ নয় তা ধর্মই হতে পারে না।

অনুরূপভাবে ভগবান, দেবদেবী, মহাপুরুষ প্রভৃতি সম্পর্কেও এ একই ধারণা গড়ে তোলা হয়েছিল। অর্থাৎ— ভগবান, দেবদেবী এবং মহাপুরুষ হতে হলে তাঁদের জন্ম, জীবনযাত্রা, কার্যকলাপ প্রভৃতি অতি অবশ্যই অদ্ভুত, অলৌকিক, অস্বাভাবিক এবং চমকপ্রদ হতে হবে। আর যিনি বা যার জন্ম, জীবনযাত্রা ও কার্যকলাপাদি যত বেশি অলৌকিক, যত বেশি অস্বাভাবিক এবং যত বেশি চমকপ্রদ তিনি তত বড় ভগবান, তত বড় দেবতা এবং তত বড় মহাপুরুষ।

এতদ্বারা তদানিন্তন কালের ব্রাহ্মণদের গৃহীত কর্মপন্থায় প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায় সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো। পরবর্তী নিবন্ধে তৃতীয় পর্যায় সম্পর্কে আলোকপাত করা হবে।

এ প্রসঙ্গে উপসংহারে ব্রাহ্মণরা কেন দেবদেবী সংক্রান্ত এসব অদ্ভুত অবিশ্বাস্য কাহিনী ধর্মগ্রন্থের মাধ্যমে সংরক্ষিত করার ব্যবস্থা করেছিলেন সেই প্রশ্নটির উত্তর দেয়া যাচ্ছে :

পূর্বে আলোচনা প্রসঙ্গে একথা পুনঃ পুনঃ বলা হয়েছে যে, সেই বর্ণ-ব্যবস্থার শুরু থেকে বেদের পঠন-পাঠন, শ্রবণ-অনুশীলন এমনকি স্পর্শকরণও শুদ্রদের জন্য সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ এবং ভীষণ শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে ঘোষিত হয়েছিল। জাতিভেদ-প্রথা চালু করার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদের বেলায়ও সেই একই ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়।

বলাবাহুল্য, এতদ্বারা ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য সকলের জন্য ধর্মগ্রন্থ পাঠ ও ধর্ম সম্পর্কীয় স্বাভাবিক অনুসন্ধিৎসা নিবৃত্তির ক্ষেত্রে বিরাট এক শূন্যতার সৃষ্টি হয়।

এ শূন্যতার অবসান ঘটানো এবং ব্রাহ্মণদের দ্বারা ধর্ম এবং দেবদেবী সম্পর্কিত যেসব কাহিনী ও বিধি-বিধান রচিত হয়ে চলেছিল সেগুলো যে সত্য, অভ্রান্ত এবং স্বয়ং ভগবানেরই মুখনিসৃত তার প্রত্যক্ষ ও নির্ভরযোগ্য প্রমাণ হিসেবে ওগুলো পুরাণ-ভাগবতাদির মাধ্যমে সংরক্ষিতকরণ ও ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শুদ্রদের পঠনীয় ও শ্রবণীয় বলে ঘোষণা করা হয়। শুধু তা-ই নয়— তাঁদের

www.pathagar.com

জন্যে এসব গ্রন্থের পঠন, ও শ্রবণকে মহাপুণ্যজনক, পাপক্ষয়কারী এবং পারত্রিক কল্যাণের উপায় হিসেবেও বর্ণনা করা হয়।

এভাবে প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ সমাধা করার পরে তাঁরা তৃতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু করেন। আর এ তৃতীয় পর্যায়ের কাজটিই ছিল মূর্তিপূজার উদ্ভাবন ও প্রচলন। পরবর্তী নিবন্ধে সে সম্পর্কে আলোকপাত করা যাচ্ছে।

মূর্তির উদ্ভাবন ও পূজা প্রচলন

মূর্তির উদ্ভাবন ও পূজা প্রচলনের প্রশ্নে তদানিন্তন ব্রাহ্মণরা ভিন্ন ভিন্ন তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।

ভিন্ন ভিন্ন এ তিনটি দলের একটি ছিল দেবদেবীর মূর্তি নির্মাণ ও পূজা প্রচলনের ঘোর পক্ষপাতি। অন্য দলটি ছিল একাজের ঘোর বিরোধী। তৃতীয় দলটি ছিল বিশেষ শর্তসাপেক্ষে মূর্তিপূজা প্রচলনের সমর্থক।

প্রথমোক্ত দলটি যে তৃতীয় দলটির যুক্তির সারবত্তা ও গুরুত্ব উপলব্ধি করে তাদের আরোপিত শর্ত মেনে নিয়ে মূর্তি নির্মাণ ও পূজা প্রচলনের কাজে হাত দিয়েছিল তার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে।

প্রথমোক্ত দলটি যেসব যুক্তির ভিত্তিতে দেবদেবীদের মূর্তি নির্মাণ ও পূজা প্রচলনের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিল তার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি পৃথক পৃথকভাবে তুলে ধরা হবে।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় দলভুক্তগণ নিজ নিজ মতের সমর্থনে যেসব যুক্তি ও শাস্ত্রীয় প্রমাণ তুলে ধরেছিলেন সেগুলোকে পরবর্তী নিবন্ধে 'অভিমত' উপশিরোনাম দিয়ে তুলে ধরা হবে। পরিশেষে তৃতীয় দলটির আরোপিত শর্ত এবং তার পরিণতির কথা আমরা তুলে ধরবো।

আমরা জানি, মানুষের কোনও কাজই উদ্দেশ্যবিহীন নয়। এমতাবস্থায় মূর্তির উদ্ভাবন ও পূজা প্রচলনের মতো এমন একটি ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী অথচ অভিনব ও বিরাট ঝুঁকিপূর্ণ কাজ উদ্দেশ্যবিহীন হতে পারে না।

অতএব সে উদ্দেশ্যটা কি তা অবশ্যই আমাদের জেনে নিতে হবে। অন্যথায় প্রকৃত অবস্থা অনুধাবনের আমাদের এ প্রচেষ্টা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার আশংকা রয়েছে।

এ উদ্দেশ্যের কথা জানতে হলে ব্রাহ্মণদের বেছে নেয়া পথের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের কার্যকলাপের কথা বিশেষভাবে আমাদের মনে রাখতে হবে এবং

www.pathagar.com

মনে রাখতে হবে যে সেই পথেরই তৃতীয় পর্যায়ের কার্যকলাপ সম্পর্কে আমরা আলোচনায় ব্রতী হচ্ছি আর এ পর্যায়গুলো একটি থেকে অন্যটি বিচ্ছিন্ন বা পৃথক নয়।

আলোচনার সুবিধার জন্য প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের সার-সংক্ষেপ নিম্নে তুলে ধরা যাচ্ছে :

১। তদানিন্তন ব্রাহ্মণরা ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য তথা প্রবল পরাক্রান্ত এবং সমাজের বুকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাজা-মহারাজা প্রভৃতি অর্থশালী ধনিক-বণিকদের মোকাবিলায় সমাজের বুকে প্রতিষ্ঠা লাভের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

ওপরোক্ত শক্তিদ্বয় স্বাভাবিক নিয়মেই ওপর থেকে জোর করে সমাজের বুকে চেপে বসে ছিল। জনগণের মনের সাথে তাদের বিশেষ কোনও সম্পর্ক ছিল না এবং শক্তির দাপটে সম্পর্ক রাখার প্রয়োজনও তারা বোধ করে নি।

পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণরা রক্ত, বংশ, ধার্মিকতা, অলৌকিকত্ব, অতিমানবিকত্ব প্রভৃতির দাবিতে জনগণের মনের গহীনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিষ্ঠা লাভের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

২। ব্রাহ্মণরা নিজেদের ভগবান, দেবদেবীবৃন্দ ও সাধারণ মানুষদের মধ্যবর্তী এবং উভয় পক্ষের মধ্যে সংযোগ স্থাপনকারী একক ও অপরিহার্য সত্তা হিসেবে প্রতিপন্ন করার প্রচেষ্টাও নানাভাবে চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

৩। মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব হলেও মানুষকেই গোটা সৃষ্টির মধ্যে সর্বাধিক দুর্বল, সর্বাধিক অসহায় এবং সর্বাধিক পরমুখাপেক্ষী করে সৃষ্টি করা হয়েছে। অবশ্য এর বিশেষ কারণও রয়েছে। তবে সে-বিষয় এখানে আমাদের আলোচ্য নয়।

ব্রাহ্মণরা যে মানুষের এ দুর্বলতা, অসহায়তা এবং পর-মুখাপেক্ষিতাকে নিজেদের আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন সেটাই এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয়।

৪। এ সুযোগ গ্রহণ করে ব্রাহ্মণরা মানুষের প্রতিটি প্রয়োজনের পশ্চাতে কোনও না কোনও দেব না দেবীর কর্তৃত্ব বিদ্যমান থাকার যুক্তি দেখিয়ে দেবদেবীদের সংখ্যা তেত্রিশ থেকে তেত্রিশ কোটিতে উন্নীত করেছিলেন।

৫। এ দেবদেবীদের সন্তুষ্টি বা ক্রোধের কারণেই যে মানুষের জন্ম-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ, উত্থান-পতন, জয়-পরাজয়, লাভ-ক্ষতি, পাওয়া না-পাওয়া, সাফল্য-ব্যর্থতা প্রভৃতি এবং যাবতীয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ-দুর্বিপাক সংঘটিত হয়ে থাকে আর ভগবান এবং এসব দেবদেবীদের সন্তুষ্টি-বিধান ও ক্রোধ প্রশমনের যোগ্যতা এবং অধিকার যে একমাত্র ব্রাহ্মণদেরই রয়েছে সর্বসাধারণের মন-মগজে এ বিশ্বাস গড়ে তোলার প্রচেষ্টাও তাঁরা সর্বপ্রযত্নে চালিয়ে গিয়েছিলেন।

www.pathagar.com

মোটামুটিভাবে এটাই হলো প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য ব্রাহ্মণদের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের কার্যকলাপের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। তাঁদের এ কার্যকলাপকে বিধি-সম্মত বলে প্রমাণ করার জন্য তাঁরা স্বয়ং ভগবানের নামে এবং শাস্ত্রের ভাষায় যেসব ঘোষণা বাণী প্রচার করেছিলেন পাঠকবর্গের অবগতির জন্য তার দুটি মাত্রকে নিম্নে বঙ্গানুবাদসহ হুবহু উদ্ধৃত করা যাচ্ছে :

দৈব্যধীনং জগৎ সর্বং মন্ত্রাধীনাশ্চ দেবতাঃ।
তেমন্ত্রা ব্রাহ্মণাধীনাস্তস্মাদ্ ব্রাহ্মণ দৈবতম্ ॥

অর্থাৎ— সমস্ত জগত দেবতাদিগের অধীন; সমস্ত দেবতা মন্ত্রের অধীন; মন্ত্রসমূহ ব্রাহ্মণদের অধীন; অতএব, ব্রাহ্মণগণই সর্বোত্তম দেবতা এবং অন্য সব দেবতাই তাঁদের অধীন। — স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী বিরচিত "সত্যার্থ প্রকাশ" : ৬০১ পৃঃ

আমাদের প্রতিশ্রুত দ্বিতীয় ঘোষণাটি হলো :

গুরুর্ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রী গুরবে নমঃ ॥

অর্থাৎ— গুরু (ব্রাহ্মণ)-ই ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর, গুরুই পরম ব্রহ্ম; অতএব গুরুই একমাত্র নমস্য বা নমস্কারের যোগ্য।

— "গুরুগীতা" গুরু মাহাত্ম্য দ্রষ্টব্য

কিন্তু এভাবে শাস্ত্রের ভাষায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এমনকি পরম ব্রহ্মের আসন অধিকার করেও ব্রাহ্মণরা নিশ্চিন্ত হতে পেরেছিলেন না। কারণ এগুলো সবই ছিল উপদেশ বা মুখের ভাষণ এবং শাস্ত্রের বচন।

নিজেদের বিদ্যমানতাকে জনসাধারণের কাছে একান্তরূপে অপরিহার্য করে তুলতে হলে কিছু বাস্তব ও স্থায়ী কর্মপন্থা গ্রহণের প্রয়োজন তাঁরা অনুভব করেছিলেন।

বলাবাহুল্য, সেই বাস্তব ও স্থায়ী কর্মপন্থার একমাত্র না হলেও অন্যতম প্রধানটিই হলো— মূর্তিপূজার প্রচলন। অবশ্য বোধগম্য কারণেই মূর্তিপূজা প্রচলনের এ কারণটিকে ব্রাহ্মণরা স্বীকার করেননি। তাঁরা মূর্তিপূজা প্রচলনের যেসব কারণের কথা বলেছেন তার উল্লেখযোগ্য কতিপয়কে অতঃপর নিম্নে পৃথক পৃথকভাবে তুলে ধরা হবে :

তবে এ কারণসমূহ তুলে ধরার পূর্বে মূর্তিপূজাকে কেন "বাস্তব এবং স্থায়ী কর্মপন্থা" বলা হলো সেসম্পর্কে দুকথা বলার প্রয়োজন বোধ করছি।

বৈদিক যুগ থেকে আলোচ্য সময় পর্যন্ত যাগযজ্ঞ, হোম-তর্পন, দান-ধ্যান এবং বিভিন্ন দেবতার উদ্দেশ্যে বলি ও আহুতি প্রদানের কাজই প্রধান ধর্মীয় অনুষ্ঠান হিসেবে চালু ছিল।

www.pathagar.com

দেশের রাজা-মহারাজা ও ধনিক-বণিকেরা এতকাল নানা উদ্দেশ্যে বিপুল অর্থব্যয়ে এবং মহা ধুমধামের সাথে গোমেধ, অশ্বমেধ, নরমেধ, রাজসূয়, পুত্রেষ্টি প্রভৃতি যজ্ঞের আয়োজন করে এসেছেন; সাধারণ মানুষের এতে অংশগ্রহণের কোনও সুযোগ এবং অধিকার ছিল না, শুধু তা-ই নয় এতে অংশগ্রহণই তাদের জন্য সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ছিল।

অথচা সাধারণ মানুষের অন্তরে প্রতিষ্ঠা লাভই ছিল এ-সময়ে ব্রাহ্মণদের মুখ্য উদ্দেশ্য। অভিজ্ঞ মহলের অনেকেই মনে করেন যে, সেই উদ্দেশ্য সাধারণের একমাত্র উদ্দেশ্য নিয়েই সাধারণ মানুষের এতকাল পরে ধর্ম কর্মে টেনে আনা হয়েছিল এবং তাদের মধ্যে মূর্তিপূজার প্রচলন ঘটানো হয়েছিল।

এ পটভূমিকার পরে মূর্তিপূজা প্রচলনের পক্ষে যেসব যুক্তি প্রদর্শিত হয়েছিল তার উল্লেখযোগ্য কতিপয়কে পৃথক পৃথকভাবে নিম্নে তুলে ধরা যাচ্ছে :

০ পরম ব্রহ্ম বা ঈশ্বর অসীম এবং অনন্ত আর মানুষ হলো সসীম ও সীমাবদ্ধ জ্ঞানের অধিকারী। এমতাবস্থায় অসীম অনন্তকে ধারণা করা তাদের পক্ষে কোনওক্রমেই সম্ভব হতে পারে না। এ সমস্যার একটি মাত্র সমাধানই রয়েছে। আর তা হলো : তাঁর একটা প্রতীক বা প্রতিকৃতি গড়ে তোলা। যার মাধ্যমে মানুষ তাঁর সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণায় উপনীত হতে সক্ষম হয় এবং তাঁকে একান্ত কাছে ও একান্ত আপনজনরূপে পেয়ে প্রত্যক্ষভাবে নিজেদের মনের আকুতি নিবেদন করতে পারে।

০ পরম ব্রহ্ম বা ঈশ্বর বিশ্বব্যাপী বিরাজিত রয়েছেন। এমতাবস্থায় তাঁর সম্পর্কে কোনও ধারণায় উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। অথচ মানুষ তাঁকে অতি নিকটে এবং একান্ত আপনজনরূপে পেতে চায়। অতএব বিশ্বব্যাপী বিরাজিত অসীম অনন্ত সত্তাকে সীমার মধ্যে টেনে এনে মানুষের একান্ত কাছে উপস্থাপিত করা প্রয়োজন। প্রতীক বা মূর্তি নির্মাণের মাধ্যমেই একাজকে সহজ ও সম্ভব করে তোলা যেতে পারে।

০ পরম ব্রহ্ম বা ঈশ্বর অনন্ত শক্তির অধিকারী। অথচ বাহন ব্যতীত শক্তি পরিদৃশ্যমান ও মানুষের বোধগম্য হতে পারে না। প্রতীক বা মূর্তিই সেই অনন্ত মহাশক্তির বাহন। এ বাহনের পূজা করা হলেই তার পূজা করা হয়।

০ পরম ব্রহ্ম বা ঈশ্বর সর্বজ্ঞ ও সর্বদর্শী। এমতাবস্থায় তাঁর উদ্দেশ্যে প্রতীক, মূর্তি বা যা কিছুরই পূজা করা হোক না কেন এটা যে তাঁরই পূজা তা অবশ্যই তিনি বুঝতে পারেন। এদিক দিয়ে মূর্তি গড়াই প্রকৃষ্ট উপায়।

০ দেবদেবীরা সেই অনন্ত মহাশক্তিরই অংশ এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিশেষ। অথচ সেই অনন্ত মহাশক্তি এবং দেবদেবীরা চিন্ময়; সুতরাং চর্মচক্ষে পরিদৃশ্যমান নন, যা চর্মচক্ষে অপরিদৃশ্যমান তাকে ধারণা করা যায় না। আর যাকে ধারণা

www.pathagar.com

করা যায় না তাঁর পূজা এবং তাঁর উদ্দেশ্যে আবেদন নিবেদনও সম্ভব হতে পারে না। মৃন্ময় মূর্তির মাধ্যমে সেই চিন্ময়কে চর্মচক্ষে পরিদৃশ্যমান করে তোলা সম্ভব। আর মৃন্ময় মূর্তির পূজা আসলে যে সেই চিন্ময়েরই পূজা সেকথা বলাই বাহুল্য।

০ সিদ্ধা পুরুষগণ ঈশ্বর বা ভগবানের নিকট থেকে সরাসরিভাবে অথবা ধ্যানযোগে কিংবা দিব্যদৃষ্টি দ্বারা দেবদেবীদের অদ্ভুত অলৌকিক জন্ম বৃত্তান্ত এবং কার্যকলাপাদি সম্পর্কে অবহিত হয়ে থাকেন।

সাধারণ মানুষের পক্ষে তা অনুধাবন করা সম্ভব নয়। সিদ্ধ পুরুষদের মাধ্যমে লব্ধ পরিচয় অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন দেবদেবীর ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি গড়াকেই এ সমস্যা সমাধানের প্রকৃষ্ট উপায় হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

তাছাড়া পূজার এক পর্যায়ে ব্রাহ্মণরা সংশ্লিষ্ট দেব বা দেবীর আবাহন এবং মন্ত্রের সাহায্যে মূর্তির মধ্যে তাঁর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। ফলে ঐ মূর্তির মধ্যে সংশ্লিষ্ট দেব বা দেবীর আবির্ভাব ঘটে। পূজার পরে মন্ত্রের মাধ্যমে তাঁদের তিরোভাব ঘটানো হয়ে থাকে।

অতএব মূর্তি নির্মাণই চিন্ময় ও অদ্ভুত অলৌকিক-দেবদেবীদের পূজানুষ্ঠান ও সন্তুষ্টি বিধানের একমাত্র উপায়।

অভিমত

পূর্ববর্তী নিবন্ধে উল্লেখিত দ্বিতীয় দলটি অর্থাৎ যাঁরা মূর্তিপূজার ঘোর বিরোধী ছিলেন তাঁরা তাঁদের এ বিরোধিতার যেসব কারণের কথা বলেছিলেন আমরা প্রথমে তার উল্লেখযোগ্য কতিপয়কে নিম্নে পৃথক পৃথকভাবে তুলে ধরবো।

তাঁদের এ বিরোধিতার অনুকূলে তাঁরা যেসব শাস্ত্রীয় প্রমাণ তুলে ধরেছিলেন পরে একে একে তার কতিপয়কে তুলে ধরা হবে। পরিশেষে কতিপয় চিন্তাশীল মণীষীর এ সম্পর্কীয় অভিমত আমরা তুলে ধরবো।

০ সেই অনন্ত পরম ব্রহ্ম বা ঈশ্বরই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। অতএব মানুষের দুর্বলতা, সীমাবদ্ধতা, ভুলত্রুটি-প্রবণতা প্রভৃতির কথা অবশ্যই তিনি পরিজ্ঞাত রয়েছেন।

তিনি অসীম অনন্ত বিধায় তাঁকে সম্যকরূপে জানা বা ধারণা করা যে মানুষের পক্ষে সম্ভবই নয় সেকথাও অবশ্যই তাঁর জানা রয়েছে।

www.pathagar.com

সকল মানুষের জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বুদ্ধিমত্তা, চিন্তাশক্তি প্রভৃতি যে সমান নয় এবং মানুষ যে তাদের নিজ নিজ সাধ্যশক্তি অনুযায়ী তাঁকে জানবে আর এটাই যে স্বাভাবিক সেকথাও অবশ্যই তাঁর জানা রয়েছে।

যেহেতু তাঁকে সম্যকরূপে জানার সাধ্যশক্তিই তিনি মানুষকে দেননি অতএব সম্যকরূপে জানার দাবিও তিনি করতে পারেন না। আর যেখানে সম্যকরূপে জানা সম্ভবই নয় সেখানে প্রতীক-মূর্তি বা পুতুল-প্রতিমা প্রভৃতি কোনও কিছুর দ্বারাই তো সম্ভব হতে পারে না।

এমতাবস্থায় প্রতীক, মূর্তি বা পুতুল-প্রতিমা নির্মাণ যে শুধু পণ্ডশ্রমই নয়— ধৃষ্টতারও শামিল সেকথা খুলে বলার প্রয়োজন হয় না।

০ পরম ব্রহ্ম বা ঈশ্বর মানুষকে জ্ঞান, বিবেক, চিন্তাশক্তি, দৃষ্টিশক্তি প্রভৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর দেয়া এসব যোগ্যতার দ্বারা মানুষ সৃষ্টি রহস্য দেখতে ও অনুধাবন করতে সক্ষম হয়। ফলে নিজ নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী তাঁর বিরাটত্ব, সৃষ্টি-নৈপুণ্য, সংরক্ষকত্ব ও পরিচালনা-শক্তি প্রভৃতি সম্পর্কে তারা একটা ধারণায় উপনীত হয়ে থাকে।

অন্য কথায় যেখানে নিজ নিজ যোগ্যতানুযায়ী তাঁকে জানা ও উপলব্ধি করার জন্য গোটা বিশ্বটাই মানুষের চোখের সম্মুখে স্বয়ং তিনিই প্রতীক হিসেবে তুলে ধরেছেন সেখানে নতুন করে প্রতীক বা মূর্তি নির্মাণকে এতটা বিরাট প্রহসন ও অনধিকার চর্চা ছাড়া আর কিছুই বলা যেতে পারে না।

০ পরম ব্রহ্ম বা ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী, সর্বশ্রোতা এবং সর্বস্রষ্টা। মানুষের অন্তরের খবরও তিনি পরিজ্ঞাত রয়েছেন। এমতাবস্থায় মানুষ যেখানে, যে অবস্থায়, যেভাবে এবং যে-কোনও ভাষায় তাঁর উদ্দেশ্যে প্রাণের আকুতি নিবেদন ও ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শন করুক সঙ্গে সঙ্গে তিনি তা জানতে ও দেখতে পারেন এবং এটাই স্বাভাবিক। এমনকি কারো অন্তরের অন্তস্থলেও যদি তাঁর প্রতি প্রেম-ভক্তি ও ভালোবাসা লুকানো থাকে তা-ও তাঁর অপরিজ্ঞাত নয়।

এমতাবস্থায় তাঁকে ডাকা, প্রেম-ভক্তি, প্রদর্শন করা বা প্রাণের আকুতি নিবেদন করার জন্য প্রতীক বা মূর্তি নির্মাণের কোনও প্রয়োজন থাকতে পারে না। বরং এদিয়ে তাঁর সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী, সর্বশ্রোতা এবং সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হওয়াকেই ব্যঙ্গ করা হয়।

০ পরম ব্রহ্ম বা ঈশ্বর এবং দেবদেবীরা চিন্ময় বা চৈতন্যস্বরূপ। যেহেতু তাঁরা কেউ স্থূল-দেহী নন অতএব তাঁদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা, ক্ষয়-ক্ষতি, অভাব-অভিযোগ প্রভৃতি থাকতে পারে না— থাকা সম্ভবই নয়।

www.pathagar.com

অথচ ব্রাহ্মণরা মূর্তি স্থাপন করে সেই মূর্তির সম্মুখে তাঁরই উদ্দেশ্যে ভোগ-নৈবেদ্যাদির আকারে লোভনীয় খাদ্য-পানীয় প্রভৃতি পরিবেশন ও নিবেদন করে থাকেন।

এতদ্বারা বিশ্ববাসীর কাছে তাঁকে ভোগ-বিলাসী, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর এবং পরমুখাপেক্ষীরূপেই তুলে ধরা হয়ে থাকে। এটা শুধু যে ধৃষ্টতাই নয় অতি জঘন্য পাপও সেকথা খুলে বলার অপেক্ষায় রাখে না। প্রতীক বা মূর্তিপূজাই যে এ ধৃষ্টতা এবং পাপের মূল সেকথাও খুলে বলার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করি না।

০ দেবদেবীরা যে ব্রাহ্মণদের কল্পনা-প্রসূত এবং তাদের প্রায় সকলকেই লম্পট, চরিত্রহীন, পরস্ত্রীর সতীত্ব নষ্টকারী প্রভৃতিরূপে চিত্রিত করা যে পুরাণপ্রণেতা ব্রাহ্মণদেরই বিকৃত রুচির পরিচায়ক সেকথা খুলে বলার প্রয়োজন হয় না।

পূজার সময়ে দেবদেবীদের উদ্দেশ্যে পাদ্য—অর্ঘ, ভোগ, পানীয়, আচমণীয়, তাম্বুল প্রভৃতি নিবেদনের ব্যবস্থা অতীব হাস্যকর।

কেননা দাবি করা হয়ে থাকে যে, দেবদেবীরা সকলেই চিন্ময়। চিন্ময়কে পদব্রজে পূজকের বাড়িতে বা অন্য কোথাও যেতে হয় না। অতএব তাঁদের উদ্দেশ্যে পাদ্য (পা-ধোয়ার জল) নিবেদনেরও প্রশ্ন উঠতে পারে না।

তাছাড়া ব্রাহ্মণদের দাবি এবং পুরাণ-ভাগবতাদির বর্ণনানুযায়ী প্রতিটি দেবদেবীরই গরু, ঘোড়া, হাঁস, ইঁদুর, গাধা, কুকুর, ময়ূর, সাপ, সিংহ প্রভৃতি কোনও না কোনও বাহন রয়েছে। তাঁরা যদি বাহনে চড়েই আসেন তা হলেও পাদ্য বা পা-ধোয়ার জল সরবরাহের প্রশ্ন উঠতে পারে না।

অতএব দেবদেবীদের উদ্দেশ্যে পাদ্য নিবেদনকে একটা বিরাট অজ্ঞতা এবং খামখেয়ালি ছাড়া কিছুই বলা যেতে পারে না। তারপরে ভোগ (খাদ্য), পানীয়, (খাবার জল), অচমণীয় (মুখ ধোয়ার জল), তাম্বুল (পানসুপারি) প্রভৃতি নিবেদনকেও একটা বিরাট তামাসা ছাড়া আর কিছু বলার ভাষা খুঁজে পাওয়া যায় না।

মূর্তিপূজার প্রবর্তকদের অবশ্যই মনে রাখা উচিত ছিল যে, দেবদেবীরা সকলেই স্বর্গলোকের অধিবাসী, সেখানে পান-সুপারি হয় না সুতরাং পানসুপারি খাওয়ার অভ্যাসও তাঁদের গড়ে উঠতে পারে না। দেবদেবীরা যদি বাংলাদেশ বা আর্যাবর্তের অধিবাসী হতেন তা হলেও অগত্যা ধরে নেয়া যেতো যে তাঁরা পান-সুপারিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

www.pathagar.com

মূর্তিপূজার প্রবর্তক ব্রাহ্মণরা মূর্তিপূজার যৌক্তিকতা প্রমাণের জন্য সাধারণ মানুষের মন-মগজে অন্য যে বিশেষ ধারণাটি বদ্ধমূল করে তোলার প্রয়াস পেয়েছিলেন তা হলো :

ঈশ্বর এত বিরাট এবং এত উর্ধ্বলোকে অবস্থিত যে শত চেষ্টা করেও তাঁর নাগাল পাওয়া সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব হতে পারে না।

বিভিন্ন দেবদেবী মুণি মহাপুরুষ, গুরু-পুরোহিত প্রভৃতিরা কেউবা ঈশ্বরের স্ত্রী, কেউবা পুত্র, কেউবা প্রিয় পাত্র প্রভৃতি। পূজার্চনা, ভোগ, দান, নামকীর্তন প্রভৃতির মাধ্যমে এদেরকে সন্তুষ্ট করতে পারলে এঁরাই ঈশ্বরের কাছে সুপারিশ বা মধ্যস্থতা করে এসব পূজকের বিপদাপদ ও ইহ-পরকালের মুক্তি ও মঙ্গলের ব্যবস্থা করে দেবেন।

এ সম্পর্কে দ্বিতীয় দলটি অর্থাৎ মূর্তিপূজা বিরোধীদের বক্তব্য এই ছিল যে, ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী নিরপেক্ষ এবং অসীম করুণাময়। অতএব তাঁর কাছে সুপারিশ বা মধ্যস্থতা করার কোনও প্রশ্নই উঠতে পারে না এবং তেমন কোনও সুযোগও থাকতে পারে না।

মূর্তিপূজার সমর্থক ব্রাহ্মণদের এসব কার্যকলাপকে বর্বর যুগীয় চিন্তার ফসল ছাড়া আর কিছুই বলা যেতে পারে না। আর মূর্তিপূজা প্রচলনের ফলেই যে এ ধরনের কার্যকলাপ সমাজে স্থান পেয়েছে এবং স্থায়ী হয়ে রয়েছে সেকথাও কেউ অস্বীকার করতে পারে না।

ওপরোল্লেখিত দ্বিতীয় দল অর্থাৎ মূর্তিপূজা বিরোধীদের এ সম্পর্কীয় আর যেসব অভিমত রয়েছে স্থানাভাববশত সেগুলোকে এখানে তুলে ধরা সম্ভব হলো না বলে আমরা বিশেষভাবে দুঃখিত। অতঃপর তাঁরা তাঁদের এসব অভিমতের সমর্থনে যেসব শাস্ত্রীয় প্রমাণ তুলে ধরেছিলেন তার কতিপয়কে নিম্নে উদ্ধৃত করা যাচ্ছে :

নতস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্‌যশঃ।

অর্থাৎ— যাহার নাম মহদ্‌যশঃ অর্থাৎ যিনি যাবতীয় মহৎ গুণের অধিকারী সেই পরম প্রভুর কোনও প্রতিমা বা তুলনা হইতে পারে না।

— যজুর্বেদ, ৩২ অঃ, ৩য় মন্ত্র

অন্ধতমঃ প্রবিশন্তি যেহ সম্ভূতি মুপাসতে।

ততো ভূয় ইব তে তমো যউ সম্ভূত্যাঁরতাঃ ॥ ১ ॥

অর্থাৎ— যাহারা ব্রহ্মের স্থানে "অসম্ভূতি" অর্থাৎ অনুৎপন্ন প্রকৃতির উপাসনা করে তাহারা অন্ধকার অর্থাৎ অজ্ঞানতা এবং দুঃখসাগরে নিমগ্ন হয়।

— যজুর্বেদ, ৪০ অঃ

www.pathagar.com

যদ্বচোন ভ্যুদি তং যেন বাগভ্যুদ্যতে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদ মুপাসতে ॥ ২ ॥

অর্থাৎ— যাহারা ব্রহ্মের স্থানে "সম্ভূতি" অর্থাৎ কারণ হইতে উৎপন্ন কার্যরূপ পৃথিব্যাদি ভূত, পাষাণ ও বৃক্ষাদির অবয়ব এবং মনুষ্যাদির শরীরের উপাসনা করে, তাহারা উক্ত অন্ধকার অপেক্ষাও অধিকতর অন্ধকার অর্থাৎ মহামূর্খ চিরকাল ঘোর দুঃখরূপ নরকে পতিত হইয়া মহাক্লেশ ভোগ করে।

অজ্ঞা যজন্তি বিশ্বেশং পাষাণাদিষু কেবলম্।

অর্থাৎ— অজ্ঞ লোকেরা পাষাণাদিকেই ঈশ্বর বলিয়া অর্চনা করে।

— বৃহৎ নারদীয় পুরাণ

অহং সর্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাহ বস্থিতঃ সদা
তম বজ্ঞায় মাং মর্ত্যঃ করুতেহর্চা বিড়ম্বনম্ ॥

অর্থাৎ— আমি সর্বভূতে ভূতাত্ম স্বরূপে অবস্থিত আছি; অথচ অজ্ঞ লোকেরা সেই আমাকে অবজ্ঞা করিয়া মনুষ্য প্রতিমাদিতে পূজারূপ বিড়ম্বনা করিয়া থাকে।

— ভাগবত, ৩য় স্কন্দ, ২৯ অঃ, ২১ শ্লোক

যো মাং সর্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরম্।
হিত্বাহর্চাং ভজতে মৌঢ়াদ্ ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ ॥

অর্থাৎ— যে সর্বভূতে অবস্থিত আমাকে উপেক্ষা করিয়া প্রতিমার ভজনা করে সে ভস্মে ঘৃতাহুতি দেয় ॥ — ঐ ২২ শ্লোক

মনসা কল্পিতা মূর্তি নৃণাং চেন্মোক্ষ সাধনী।
স্বপ্ন লবোন রাজ্যেন রাজোনো মানবাস্তথা ॥

অর্থাৎ— মনের কল্পিত দেবমূর্তি যদি মনুষ্যদিগকে মোক্ষদান বা পরিত্রাণ করিতে পারিত তবে মনুষ্যগণ স্বপ্নলব্ধ রাজ্য দ্বারাও রাজা হইতে পারিত।

—মহানির্বাণ তন্ত্র

অব্যক্তং ব্যক্তি মা পন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্ ॥

অর্থাৎ— অল্পবুদ্ধি জনগণ আমার নিত্য, সর্বোৎকৃষ্ট পরম স্বরূপ অবগত নহে, তাহারা অজ্ঞতার জন্য আমাকে ব্যক্তি (মনুষ্য, মৎস, কুর্ম প্রভৃতি) ভাব বলিয়া মনে করে। — শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৭ম অঃ, ২৪ শ্লোক

ইতোপূর্বে মহাভারতের উদ্ধৃতি তুলে ধরে দেখানো হয়েছে : বেদ-বিভাগকারী, বহু ধর্মীয় গ্রন্থ-প্রণেতা, মহামুণি বেদব্যাস ধ্যানে ঈশ্বরের রূপ কল্পনা, স্তবস্তুতির মাধ্যমে তাঁর অনন্ত গুণকে সীমাবদ্ধকরণ এবং তীর্থযাত্রা দ্বারা তাঁর বিশ্বব্যাপকতা হ্রাস করার কারণে অনুতপ্ত হয়ে কাতরভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন।

www.pathagar.com

মহামুণি বেদব্যাস পণ্ডিতের মতো ব্যক্তি যেখানে ঈশ্বরের রূপ কল্পনা করাই মহাপাপ বলে স্বীকার করছেন সেখানে সেই রূপের মূর্তিনির্মাণ যে কত বড় মহাপাপ সেকথা ভেবে দেখা প্রয়োজন।

মূর্তিপূজার অসারতা সম্পর্কে এমনি ধরনের বহু শাস্ত্রীয় প্রমাণই সেদিন আমাদের কথিত দ্বিতীয় দলভুক্ত ব্যক্তিরা তুলে ধরেছিলেন। বাহুল্য বোধে সেগুলো এখানে আর উদ্ধৃত করা হলো না।

অতঃপর প্রখ্যাত মণীষীদের এ সম্পর্কীয় অভিমতের মাত্র কয়েকটি নিম্নে তুলে ধরা যাচ্ছে।

প্রথমেই আর্যসমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠা, প্রখ্যাত পণ্ডিত স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী মহাশয়ের লিখিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "সত্যার্থ প্রকাশ" থেকে তাঁর এসম্পর্কীয় কতিপয় অভিমত তুলে ধরা হলো :

'মূর্তিপূজা করা পাপ' এ উপশিরোনাম দিয়ে উক্ত গ্রন্থের ৫৪১ পৃষ্ঠায় তিনি যে অভিমত প্রকাশ করেছেন তা হলো— "বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান করিলে ধর্ম তাহা না করিলে অধর্ম। সেই রূপ নিষিদ্ধ কর্ম করিলে অধর্ম এবং তাহা না করিলে ধর্ম। যখন তোমরা বেদ-নিষিদ্ধ মূর্তিপূজা প্রভৃতি কর্ম কর তখন তোমরা পাপী নহ কেন?"

"মূর্তির পূজা করা অধর্ম, উহা সিঁড়ি নহে— মরণ ফাঁদ" শীর্ষক উপশিরোনাম দিয়ে অতঃপর তিনি উক্ত গ্রন্থের ৫৪৩ পৃষ্ঠায় অভিমত প্রকাশ করেছেন ... "জড়পূজা দ্বারা মনুষ্যের জ্ঞান কখনও বৃদ্ধি হইতে পারে না, বরং মূর্তিপূজা দ্বারা যে জ্ঞান আছে তাহাও নষ্ট হইয়া যায়। ... পাষাণাদি নির্মিত মূর্তির পূজা দ্বারা কেহ কি কখনও পরমেশ্বরকে ধ্যানে আনিতে পারে? না না"।

"মূর্তিপূজা সোপান নহে কিন্তু একটি প্রকাণ্ড গর্ত। তন্মধ্যে পতিত হইলে মনুষ্য চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়। পুনরায় সেই গর্ত হইতে সে বাহির হইতে পারে না, কিন্তু তন্মধ্যেই সে মরিয়া যায়।"

"মূর্তিপূজার উপলক্ষ্যে লোকেরা কোটি কোটি টাকা মন্দিরে ব্যয় করিয়া দরিদ্র হইয়া পড়ে এবং মন্দিরে প্রমাদ ঘটে।"

"মন্দিরে স্ত্রী পুরুষের মেলামেশা হয়। তাহাতে ব্যভিচার, কলহ-বিবাদ এবং রোগাদি উৎপন্ন হয়"।

"মূর্তিপূজার ভরসায় শত্রুর পরাজয় এবং নিজের বিজয় মনে করিয়া মূর্তিপূজক নিচেষ্ট থাকে। ফলে নিজের পরাজয় হইলে রাজ্য, স্বাতন্ত্র্য এবং ঐশ্বর্য সুখ শত্রুর অধীন হয় ...."।

www.pathagar.com

"দুষ্টবুদ্ধি পূজারীদিগকে যে ধন দেওয়া হয় তাহা তাহারা বেশ্যা, পরস্ত্রীগমন, মদ্যপান, মাংসাহার এবং কলহবিবাদে ব্যয় করে। তাহাতে দাতার সুখের মূল নষ্ট হইয়া দুঃখ সৃষ্টি করে"।

"যাহারা জড় পদার্থের ধ্যান করে, তাহাদের আত্মাও জড়বুদ্ধি হয়। কারণ ধ্যানের জড়ত্ব-ধর্ম অন্তঃকরণ দ্বারা অবশ্য আত্মায় সঞ্চারিত হয়।"

"আরণ্য সংস্কৃতি" নামক গ্রন্থের সুপ্রসিদ্ধ লেখক জনাব আব্দুস সাত্তার উক্ত গ্রন্থের ৪৪ পৃষ্ঠায় সুপণ্ডিত সুধীর বাবুর এ সম্পর্কীয় একটি অভিমত তুলে ধরেছেন। তা হলো— "বৈদিক এবং পৌরাণিক যুগের পুরোহিতপুষ্ট দেবদেবীর প্রভাব আমাদের সমাজে আজও অপ্রতিহত। এর পার্শ্বে আর একদল দেবদেবীও সেই আদিম থেকেই প্রভাব বিস্তার করে আসছে। এরা ব্রাহ্মণ পুরোহিতের করুণা লাভের জন্য অপেক্ষা করে নি। ব্রাহ্মণশাসিত সমাজের পূজা প্রাপ্তির জন্য এদের মাথা ব্যথা নেই। তবু একথা অস্বীকার করা যায় না যে, এদের প্রচলিত নাম— গ্রামদেবতা"।

"বাংলাদেশে সংস্কৃতি-সমন্বয়ের আদি পর্বেই এ অকুলীন দেবতার দল মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল। অন-আর্য সংস্কৃতির অন্তশীলা প্রবাহের স্রোত রেখা ধরেই এদের আবির্ভাব।"

"দেব-পূর্ব যুগের সবকথা আমাদের জানবার কথা নয়। কিন্তু ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, মিত্র প্রভৃতি বৈদিক দেবতার পুরা কাহিনীর অঙ্গাবরণ নেই বলে এ সব দেবতার স্বরূপ বুঝতে অসুবিধা হয় না। বলাবাহুল্য, আদিম মানুষের যে ভয় এবং বিশ্বাস ভূত-প্রেত আত্মার জন্ম দিয়েছিল সেই ভয় এবং বিশ্বাসই পরিমার্জিত সংস্করণের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যকে দেবতার পর্যায়ে উন্নীত করেছে"।

"বৈদিক দেবতা তো আসলে প্রকৃতি দেবতা ছাড়া আর কিছু নয়। বৈদিক দেবতাদের ক্রমবিকাশের পর্যায়টি মানবসমাজের অভিব্যক্তির সূত্রের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য।"

"ঋগ্বেদের দেবতত্ত্বের মধ্যে আদিম মানুষের বিশ্বাসই নিহিত। জীব-পূজা, অচেতন পদার্থপূজা এবং সর্ব-প্রাণপূজার সংমিশ্রণে বৈদিক দেবতার আবির্ভাব এবং এ দেবতাদের ক্রমবিকাশের আদি পর্বটি গ্রামদেবতাদের আবির্ভাবের সঙ্গেও জড়িত।"

বলাবাহুল্য, শ্রদ্ধেয় সুধীর বাবু এখানে "জড়পূজা" দ্বারা মাটি, পাথর, কাঠ প্রভৃতি নির্মিত মূর্তিপূজার কথাই বোঝাতে চেয়েছেন এবং দেবদেবী ও মূর্তিপূজা যে ব্রাহ্মণদের দ্বারাই উদ্ভাবিত ও প্রচলিত হয়েছে সেদিকে ইঙ্গিত করেছেন।

www.pathagar.com

ইন্দ্রের অপর নাম যে 'পুরন্দর' শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই সেকথা জানা রয়েছে। হরপ্পা ও মহেঞ্জদারো খননের পরে প্রত্নতাত্ত্বিকরা তথাকার সম্পর্কে যে অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন তার সার-সংক্ষেপ হলো :

উক্ত দুস্থানে দ্রাবিড়সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। আর্যরা ভারতে আসার পরে তাদের একটি দল ইন্দ্রের নেতৃত্বে উক্ত স্থানদ্বয় অধিকার করেন। তথাকার 'পুর' বা বাসস্থানসমূহ ইন্দ্রের নেতৃত্বে ধ্বংস হয় বলে আর্যরা ইন্দ্রের এই 'পুরন্দর' নাম দিয়েছিলেন। পুরন্দর অর্থ— 'পুর' বা বাসস্থান ধ্বংসকারী।

এ থেকে বুঝতে পারা সহজ যে, ইন্দ্র তদানিন্তনকালের আর্যদেরই একজন ছিলেন। অথচ ভক্তির আতিশয্যে সেই ইন্দ্রকে স্বর্গের দেবতা বানানো হয়েছে, তাঁর উদ্দেশ্যে স্তবস্তুতি করা হয়েছে, তাঁকে লক্ষ্য করে বহুসংখ্যক দেবমন্ত্রও রচিত হয়েছে। পুরাণে তাঁর বীরত্ব সম্পর্কে অদ্ভুত অদ্ভুত বহু কাহিনী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। অথচ তিনি ছিলেন একজন মানুষ।

অনুরূপভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা তুলে ধরা যেতে পারে। তিনি ছিলেন দ্বারকার রাজা। তদানিন্তন কালে তিনি যে একজন প্রখ্যাত বীর ও কূটনীতিক ছিলেন তার বহু প্রমাণ আমাদের হাতেই রয়েছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে বেশ চতুরতার সাথে তিনি পাণ্ডবপক্ষে যোগ দেন এবং অর্জুনের রথের সারথ্য গ্রহণ করেন। এ যুদ্ধে তাঁর গৃহীত ভূমিকা মোটেই সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। মোটকথা, একজন মানুষ ছিলেন।

অথচ, অতিভক্তের দল তাঁকে শুধু ভগবান বানিয়েই ক্ষান্ত হয় নি— তাঁর ভগবানত্বের দাবিকে সুদৃঢ় ও জনগণের গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য বহুসংখ্যক বেদ-মন্ত্র রচিত হয়েছে; পুরাণ-ভাগবতাদি গ্রন্থে তাঁর সম্পর্কে বহু অদ্ভুত অবিশ্বাস্য কাহিনী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং তাঁর মূর্তি নির্মাণ করে সেই মূর্তিকে পূজার আসনে বসানো হয়েছে। দেবদেবীদের উদ্ভব কিভাবে ঘটেছে বা ঘটানো হয়েছে এ থেকে তার সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়।

এবারে আসুন, আমাদের কথিত তৃতীয় দলটি কোন বিশেষ শর্তে মূর্তিপূজা সমর্থন করেছিল তা জানতে চেষ্টা করি।

মূর্তিপূজার পক্ষপাতি আমাদের কথিত প্রথম দলটি মূর্তি নির্মাণ ও পূজা প্রচলনের পক্ষে যেসব যুক্তির অবতারণা করেছিল যথাস্থানে তার কতিপয়ের বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। বিশেষ কারণে খুবই অনুধাবন যোগ্য একটি যুক্তির বিবরণ সেখানে তুলে ধরা হয়নি। সেই যুক্তিটি এই ছিল যে :

মানুষের মন খুবই চঞ্চল; এতই চঞ্চল যে বিশেষজ্ঞরা মনকেই সর্বাধিক চঞ্চল বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। তবে চঞ্চল মন দিয়েও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা

www.pathagar.com

চর্মচক্ষে পরিদৃশ্যমান কোনও কিছু সম্পর্কে চিন্তা করা এবং একটা ধারণায় উপনীত হওয়া সম্ভব।

কিন্তু অসুবিধা হলো, ঈশ্বর এবং দেবদেবীরা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা চর্মচক্ষে পরিদৃশ্যমান নন বলে এ চঞ্চল মন দিয়ে তাঁদের সম্পর্কে চিন্তা করা এবং একটা ধারণায় উপনীত হওয়া কোনওক্রমেই সম্ভব হতে পারে না।

অতএব এমন কিছু করা দরকার যদ্বারা এ চঞ্চল মনকে একটি মাত্র কেন্দ্রের প্রতি কিছুক্ষণের জন্য হলেও সর্বোতভাবে নিবদ্ধ করা যেতে পারে এবং এ প্রক্রিয়ার অনুশীলনের মাধ্যমে মন নিবদ্ধ করার একটা অভ্যাস গড়ে উঠতে পারে।

বলাবাহুল্য, এ অভ্যাস গড়ে ওঠার পরেই সার্থকভাবে চিন্ময় ঈশ্বর এবং দেবদেবীদের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করা ও তাঁদের সম্পর্কে একটা ধারণায় উপনীত হওয়া সম্ভব।

আর এ অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য ঈশ্বর ও দেবদেবীদের প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন প্রতীক বা মূর্তি নির্মাণই সর্বোকৃষ্ট ব্যবস্থা। এ অভ্যাস গড়ে ওঠার পরে প্রতীক বা মূর্তির যে কোনও প্রয়োজনই থাকতে পারে না সেকথা অনায়াসেই বুঝতে পারা যাচ্ছে। অতএব এটা একটা সাময়িক ব্যবস্থামাত্র। এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে প্রতীক বা মূর্তি লক্ষ্য নয়— লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার একটা উপায় বা উপলক্ষ্যমাত্র।

আমাদের কথিত তৃতীয় দলটি প্রথমোক্ত দলের এসব যুক্তির কিছুটা সারবত্তা থাকার কথা স্বীকার করে নিয়েও শর্ত আরোপ করেছিলেন যে, যেহেতু প্রতীক প্রতিমারা ঈশ্বর নয়— দেবতাও নয়; আর যেহেতু ওসবের পূজার অন্যান্য আপত্তিকর দিক ছাড়াও সৃষ্টির সেরা মানুষের পক্ষে মাটি, কাঠ বা পাথরে গড়া প্রতীক বা মূর্তির চরণে প্রণত হওয়া এবং কৃপা করুণার ভিখারী হওয়া ভীষণভাবে অবমাননাকরও। অতএব যথাযোগ্য চেষ্টা সাধনার মাধ্যমে দ্রুততার সাথে এ পর্যায় অতিক্রম করতে এবং প্রতীক প্রতিমার অপসারণ ঘটাতে হবে।

উল্লেখ্য যে, পরবর্তীকালে এমনকি আধুনিক কালের বিদগ্ধ পণ্ডিত ব্যক্তিরাও প্রতীক বা মূর্তিপূজা যে একান্তই একটা সাময়িক ব্যাপার এবং প্রশিক্ষণমাত্র সুতরাং যতশীঘ্র সম্ভব এবং প্রশিক্ষণের পরিসমাপ্তি ও প্রতীক— প্রতিমার অপসারণ প্রয়োজন বলে দৃঢ়কণ্ঠে তাঁদের অভিমত ব্যক্ত করেছেন এবং করে চলেছেন।

উদাহরণস্বরূপ এ ধরনের দুটি মাত্র অভিমত নিম্নে তুলে ধরা যাচ্ছে : প্রখ্যাত পণ্ডিত স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী তাঁর লিখিত "সত্যার্থ প্রকাশ" এর ৩৬ পৃষ্ঠায় এ সম্পর্কে যে অভিমত ব্যক্ত করেছে তা হলো :

www.pathagar.com

"…. এই কারণে অজ্ঞানদের জন্য মূর্তিপূজা, কেননা, সোপান-পরম্পরা অতিক্রম করিয়াই গৃহের ছাদে পৌঁছান যায়। প্রথম সোপান পরিত্যাগ করিয়া উপরে উঠিতে ইচ্ছা করিলে উঠা যায় না। এই কারণে মূর্তিই প্রথম সোপান।"

"ইহার পূজা করিতে করিতে যখন জ্ঞান হইবে এবং অন্তঃকরণ পবিত্র হইবে তখন পরম-আত্মার ধ্যান করিতে পারিবে।"

রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ঠাকুর এম, এ, সপ্ততীর্থ (স্বর্ণপদক প্রাপ্ত) দর্শন শাস্ত্রী, সিদ্ধান্ত বাগীশ, ভক্তিভূষণ প্রমুখ কতিপয় পণ্ডিত বিরচিত এবং বাংলাদেশ স্কুল টেকস্ট বুক বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত নবম ও দশম শ্রেণীর পাঠ 'হিন্দুধর্ম শিক্ষা' নামক পুস্তকে এ সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করেছেন— "সাকার উপাসক ভক্তি সহকারে প্রতিমাপূজা করেন। …. কেহ কেহ ফুলে-জলে পূজা করেন, কেহ কেহ ষোড়শোপচারেও পূজা করেন। তাঁহারা গরমের দিনে পাখার বাতাস আর শীতের দিনে পশমী কাপড়ে শ্রীমূর্তির আবরণ দিতে দ্বিধা করেন না।

"যিনি শীত গ্রীষ্মের জন্মদাতা, যাঁহার সামনে চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, আকাশ বাতাস সর্বদা নিজ নিজ কার্যে নিযুক্ত রহিয়াছে তিনি যে শীত গ্রীষ্মে কষ্ট পান ইহাই কল্পনা।"

"…. যতদিন পর্যন্ত আপনার হৃদয়মন্দিরে সর্বভূতস্থিত ঈশ্বরকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা না যায় ততদিন পর্যন্ত প্রতিমাদিতে ঈশ্বরের অর্চনা করিতেই হইবে।"

এ সুদীর্ঘ আলোচনার পরে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই এখানে প্রশ্ন জাগে যে, এত কিছু সাধ্যসাধনার পরে যে মূর্তিপূজার প্রচলন ঘটানো হয়েছিল অদ্যাপি তার কতটুকু ফল পাওয়া গিয়েছে?

এ প্রশ্নের উত্তরে অতীব দুঃখ বেদনা ও হতাশার সাথে বলতে হয় যে, এই প্রচেষ্টা অতি নিদারুণভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে এবং এ ব্যর্থতার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ আমাদের চোখের সম্মুখেই বিদ্যান।

কথাটিকে আরো পরিষ্কার করে বললে বলতে হয় যে, অতীব দ্রুততার সাথে 'মনস্থির' করার এ প্রশিক্ষণগ্রহণ করে মূর্তিপূজার অবসান ঘটানো এবং নিরাকার বিশ্বপ্রভুর ধ্যান-ধারণায় আত্মনিয়োগের আশায় এ কার্যক্রম গৃহীত হলেও হাজার হাজার বছরে অন্তত এতদ্দেশের একজন ব্যক্তিরও মনস্থির হয়নি এবং কোনও একটি স্থানেও মূর্তিপূজার অবসান ঘটেনি।

অর্থাৎ— কয়েক হাজার বছর পূর্বে যেখান থেকে যাত্রা শুরু করা হয়েছিল মূর্তিপূজকগণ আজও সেখানেই ঘুরপাক খেয়ে চলছেন। এ দেশের পূজারী ব্রাহ্মণরা পুরুষানুক্রমে বৃদ্ধ প্রপিতামহ, পিতামহ, পুত্র প্রভৃতি নির্বিশেষে প্রত্যেকে একের পর এক সারাটি জীবন মূর্তিপূজায় কাটিয়ে মৃত্যুবরণ করছেন; জীবনের

www.pathagar.com

শেষপ্রান্তে উপনীত হয়েও মনস্থির করতে এবং মূর্তিপূজার অবসান ঘটাতে সক্ষম হচ্ছেন না আমরা বিস্ময়ের সাথে প্রত্যেহ তা অবলোকন করছি।

শুধু তা-ই নয়, তাঁরা যে দিনে দিনে সেই প্রতীক বা মূর্তিকেই আসল ঈশ্বর এবং আসল দেবদেবী রূপে চিরস্থায়ীভাবে গ্রহণ করে অভিষ্ট সিদ্ধি এবং কল্যাণ ও মঙ্গল লাভের একমাত্র বিধি-সম্মত উপায় হিসেবে মহাধুমধামের সাথে ওসবের পূজার্চনা চালিয়ে যাচ্ছেন যে ঘটনাও আমাদের দৃষ্টির অগোচর নয়। এটাকে চরম ব্যর্থতা ছাড়া কি বলা যেতে পারে?

এবারে আসুন গোটা বিষয়টাকে একবার নিবিষ্ট ও নিরপেক্ষ মন নিয়ে পর্যালোচনা করি।

মূর্তি নির্মাণ তো দূরের কথা মূর্তি কল্পনাও যে অন্যায় এবং জঘন্য পাপজনক কাজ বেদাদি বিশ্বস্ততম ধর্মগ্রন্থের উদ্ধৃতি এবং কতিপয় প্রখ্যাত মহাপুরুষের সুচিন্তিত অভিমত থেকে ইতোপূর্বে সেকথা আমরা জানতে পেরেছি।

মূর্তিপূজা যে নিষ্ফল এবং মূর্খ ও অভিজ্ঞজনোচিত কাজ শ্রী মদ্ভগবদগীতা এবং কতিপয় বিশ্বস্ত ধর্মগ্রন্থের উদ্ধৃতি ও বিদগ্ধ পণ্ডিতমণ্ডলীর অভিমত থেকে সেকথাও আমরা জানতে পেরেছি।

আধুনিক যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত এ পরিবেশে প্রতীক বা মূর্তিপূজা বিশেষ করে লিঙ্গ, যোনি, গরু, ছাগল, গাছ, মাছ, শুকর, কচ্ছপ প্রভৃতির পূজা যে শুধু অশোভনীয়ই নয়— বর্বরজনোচিত কাজও সেকথা বুঝবার মতো জ্ঞানবুদ্ধি নিশ্চিতরূপেই আমাদের রয়েছে।

সর্বোপরি প্রতীক বা মূর্তিপূজা যে একটা নিদারুণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে এবং হয়ে চলেছে তার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণও আমাদের চোখের সম্মুখেই রয়েছে।

এসব কারণেই পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সভ্য-শিক্ষিত মানুষেরা যে প্রতীক বা মূর্তিপূজা চিরদিনের জন্য বর্জন করেছেন সে ঘটনাও নিশ্চিতরূপেই আমাদের অজানা নয়।

বলাবাহুল্য, এত কিছুর পরেও যারা প্রতীক বা মূর্তিপূজাকে যক্ষের ধনের মতো আঁকড়ে ধরে রয়েছেন। তাঁদের জন্য দুঃখ প্রকাশ ছাড়া আমাদের করণীয় আর কিছুই থাকতে পারে না। তাঁদের মনের পরিবর্তন ও মূর্তিপূজার অবসান ঘটুক, সারা বিশ্বের মানুষ সেই অসীম অনন্ত ও একক বিশ্বপ্রভুর দাসত্ব ও আরাধনায় তৎপর হয়ে উঠুক সেই মহান দরবারে এটাই আজ অন্তরের আকুল প্রার্থনা।

www.pathagar.com

অন্যান্য দেশের দেবদেবী

পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের মানুষেরাই যে দেবদেবী এবং তাদের অদ্ভুত অলৌকিক কার্যকলাপের প্রতি বিশ্বাসপরায়ণ ছিল তার যথেষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। দেশভেদে এবং ভাষাভেদে তাদের নাম ভিন্ন ভিন্ন হলেও চরিত্র ও কার্যকলাপের দিক দিয়ে তেমন কোনও ভিন্নতা নেই।

সেসব দেশের মানুষেরাও এককালে এসব দেবদেবীর মূর্তি নির্মাণ করেছে এবং নানাভাবে তাদের সন্তুষ্টি বিধান ও ক্রোধপ্রসমনের প্রচেষ্টা চালিয়েছে।

বর্বর যুগীয় মন-মানসের কল্পনা-প্রসূত এসব দেবদেবীর সংখ্যা যেমন প্রচুর, দাপট-দৌরাত্ম্যের কাহিনীও তেমনই চমকপ্রদ।

তবে মনে রাখা প্রয়োজন যে, অন্ধকারেই এদের জন্ম এবং অন্ধকারে থাকতেই এরা অভ্যস্ত। ফলে যেখানে অন্ধকার যত বেশি সেখানে এদের দাপট এবং প্রভুত্বও ততই জমজমাট। অন্ধকারে অভ্যস্ত বিধায় আলোর ঝলকানি এরা মোটেই সহ্য করতে পারে না। তাই দেখা যায় যে, পৃথিবীর যেসব দেশ যতই উন্নত অগ্রসর হয়েছে ততই ওরা পালিয়ে গিয়ে সেসব দেশের বন-জঙ্গল এবং নিভৃত কোণের অধিবাসী এবং উপজাতীয়দের ওপর ভর করে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে এবং আজও করে চলেছে।

সভ্য শিক্ষিত দেশসমূহের মধ্যে একমাত্র পাক-ভারত উপমহাদেশেই আজও ওদের দাপট এবং প্রভুত্ব বিদ্যমান থাকতে দেখা যায়। তবে সুখের বিষয় তথাকার একটি বিশেষ শ্রেণীর মধ্যেই এ দাপট এবং প্রভুত্ব সীমাবদ্ধ। আরও সুখের বিষয় এ দাপট এবং প্রভুত্ব দিনে দিনে হ্রাস পেয়ে চলেছে এবং কিছুদিনের মধ্যেই যে অন্যান্য দেশের মতো এখান থেকেও ওদের পাত্তারি গুটাতে হবে তার লক্ষণও দিনে দিনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে।

পৃথিবীর প্রায় সকল সভ্য দেশ থেকে মূর্তিপূজা তিরোহিত হয়েছে বলে মূর্তিপূজার গোড়ার কথা লিখতে বসে সে-সব দেশের প্রতি গুরুত্ব আরোপের প্রয়োজন অনুভূত হয়নি। ওদের সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে চুপ থাকা হলে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে বিধায় এখানে দুকথা লিখতে হচ্ছে।

www.pathagar.com

একটি কথা ভেবে আশ্চার্যানান্বিত না হয়ে পারা যায় না যে, দেশ ভিন্ন, ভাষা ভিন্ন, পরিবেশ ভিন্ন এবং তদানিন্তন কালে এক দেশের সাথে অন্য দেশের পরিচয় এবং যোগাযোগ না থাকলেও এদেশের দেবদেবীদের সাথে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের দেবদেবীদের শুধু ভাষাগত কারণে নামের ভিন্নতা ছাড়া আর কোনও ভিন্নতা খুঁজে পাওয়া যায় না।

অর্থাৎ জন্ম, স্বভাব-চরিত্র, আচার-আচরণ এবং অদ্ভুত অবিশ্বাস্য কার্যকলাপের বেলায় সকল দেশের দেবদেবীর মধ্যে বেশ একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। খুব সম্ভব কল্পনার রাজ্যে মানুষে মানুষে মিল থাকার কারণেই এটা সম্ভব হয়েছে। নিম্নের এ সংক্ষিপ্ত পরিচিতি থেকেও সুধী পাঠকবর্গ সেই মিল খুঁজে পাবেন বলে আশা করি।

আলোচনা সংক্ষিপ্তকরণের জন্যে ওসব দেশের প্রখ্যাত দেবদেবীদের মাত্র কয়েক জনের পরিচয় এখানে তুলে ধরতে হলো।

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

১. জুপিটার (Jupiter) : স্বর্গের রাজা, তিনি মানুষ ও দেবতাদের পিতা।

২. জুনো (Juno) : জুপিটারের স্ত্রী, স্বর্গের রাণী। জুনো খুবই ঈর্ষাপরায়ণা দেবী। তাঁর ঈর্ষায় স্বর্গে এবং মর্তে অনেক অঘটন ঘটেছে। মার্স, হিন্দ, লুসিনিয়া, ভল্কান প্রভৃতি তার পুত্র।

৩. ডায়েনা (Diana) : জুপিটারের কন্যা। তিনি মৃগয়া এবং সতীত্বের দেবী। একে আলোকের অধিষ্ঠাত্রী দেবীও বলা হয়ে থাকে। ইনি এ্যাপলো (সূর্যদেব)-এর যমজ ভগ্নি।

৪. অ্যাপলো (Apollo) : গ্রীক এবং রোমানদের মতে ইনি সূর্যদেব। সঙ্গীত এবং কাব্যের দেবতা হিসেবেও তাদের মধ্যে অ্যাপলোর পূজা প্রচলিত ছিল। উল্লেখ্য, সপ্তম আশ্চর্যের অন্যতম আশ্চর্য রোর্ডস দ্বীপের সুবিখ্যাত পিতল মূর্তিটি এ অ্যাপলো দেবেরই মূর্তি।

৫. অ্যারিডসা (Arethusa) : ডায়েনার সহচর; জলদেবতা অ্যালকিউস তার অনুসরণ করলে তিনি নির্ঝর রূপ ধারণ করেন।

৬ মিনার্ভা (Minerva) : জুপিটারের কন্যা। জ্ঞান, যুদ্ধবিগ্রহ ও চারুশিল্পের দেবী। তিনি দেবদাসী এবং চিরকুমারী। প্রেমের সহিত তাঁর চিরবিরোধ।

' অ্যারকিনি (Archne) : লিডিয় দেশের রাজকুমারী, উত্তম সুচীকার্য জানতেন বলে গর্ব করায় মিনার্ভা তাকে মাকড়শায় পরিণত করেন।

www.pathagar.com

৮. আইও (IO) : একজন দেবী। পিতা ইনেকাস, মাতা ইসমিনি। স্বর্গের রাজা জুপিটার তার প্রেমে মুগ্ধ হন। পরে পত্নী জুনোর ভয়ে তাকে গাভীতে রূপান্তরিত করেন। মিসর দেশে গাভীরূপে ভ্রমণকালে তিনি নিজের রূপ ফিরে পান এবং তথাকার অসাইরিসকে বিবাহ করেন।

৯. আইরিস (Iris) : টমাস ও ইলেক্ট্রার কন্যা, তিনি জলদেবীর সংবাদ-বাহিকা ছিলেন। জুনা তাকে ইন্দ্রধনুতে রূপান্তরিত করেন।

১০. ইউরেনাস (Uranus) : আকাশের দেবতা। তিনি পৃথিবী দেবীকে বিবাহ করেন। ইনি প্রসিদ্ধ দেবতা স্যাটার্নের পিতা।

১১. স্যাটার্ন (Saturn) : রোমকদের প্রাচীনতম দেবতা। তিনি স্বীয় পুত্রদের জন্মমাত্রই খেয়ে ফেলতেন, কিন্তু তার স্ত্রী রিয়া (Rhea) তাকে পুত্রের পরিবর্তে বড় বড় প্রস্তর খণ্ড খেতে দিতেন। এ রূপে কয়েকটি পুত্র মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যায়। এদের মধ্যে জুপিটার, নেপচুন ও প্লুটো অন্যতম। এ আচরণের জন্য পুত্র জুপিটারের হাতে তিনি নিহত হন।

১২. স্ফিংস্ক (Sphinx) : থিবস্-এর নিকটে বসবাসকারী এক রাক্ষস-এর মস্তক নারীর ন্যায়, দেহ সিংহের ন্যায় এবং পক্ষীর পালক ছিল। পথিকদেরকে হেঁয়ালি জিজ্ঞাসা করতো। উত্তর দিতে না পারলে খেয়ে ফেলত। ঈদিপাস নামক জনৈক পথিক একটি হেঁয়ালির উত্তর দিল এ রাক্ষস আত্মহত্যা করে। মিসরে এ রাক্ষসের একটি প্রস্তরমূর্তি বিশেষ বিখ্যাত।

১৩. ঈওলাস (Aeolus) : হিপ্পোটিসের পুত্র। ইনি বায়ুদেবতা।

১৪. এথিনা (Athena) : প্রাচীন গ্রীকদের জ্ঞান, যুদ্ধ ও চারুশিল্পের দেবী।

১৫. ফ্লোরা (Flora) : পুষ্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তার গ্রীক নাম ক্লোরিস (Cloris)।

১৬. বেলোনা (Bellona) : গ্রীক দেবতা মার্সের ভগিনী। ইনি যুদ্ধের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। পিতা ফরসিস; মাতা সিন্টো।

১৭. বোরিয়াস (Boreas) : উত্তর-পূর্ব বায়ুর দেবতা।

১৮. ব্যকাস (bacchus) : রোমকদের মদ্যদেবতা। গ্রীক নাম 'ডাইও নিসাস'। পিতা জুপিটার, মাতা সেমেলি।

১৯. মর্ফিউস (Morpheus) : নিদ্রা দেবতা, একে স্বপ্নের দেবতাও বলা হতো।

www.pathagar.com

২০. মার্কারি (Mercary) : জুপিটারের অন্যতম পুত্র। তাকে দস্যু, মেষপালক, পর্যটক, ব্যবসায়ী প্রভৃতির দেবতা বলা হতো। তিনি অন্যান্য দেবতাদের নিকট থেকে দ্রব্যাদি চুরি করে বেড়ান। তিনি ফেনাসের মেখলা, মার্সের তরবারি, জুপিটারের দণ্ড ও নেপচুনের ষষ্ঠি চুরি করে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তার মাথায় পক্ষযুক্ত একটি টুপি আছে এবং পা-এ পাখা আছে। ফলে তিনি বাতাসের মত বেগে ছুটতে পারেন।

২১. ভার্টাম নাস (Vertum nus) : ঋতু বিশেষত বসন্ত ও তৎকালে উৎপাদিত ফল পুষ্পের অধিদেবতা।

২২. ভালকান (Vulcan) : ধাতুদ্রব্য শিল্পি ও অগ্নির দেবতা। পিতা জুপিটার, মাতা জুনো, তিনি আগ্নেয়গিরিরূপে কর্মশালায় বসে দেবতাদের কর্ম তৈরি করেন।

২৩. ভেস্টা (Vesta) : গৃহ ও মেষপাল প্রভৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবী স্যাটার্ন তার পিতা এবং জুপিটার তার ভ্রাতা।

২৪. জেফাইরাস (Zephyrus) : পশ্চিম বায়ুর দেবতা। ফ্লোরা দেবীর প্রণয়ী।

২৫. ট্রাইটন (Triton) : সমুদ্রের দেবতা। নেপচুনের পুত্র। তিনি ভেরী বাজিয়ে সমুদ্রের তরঙ্গকে শান্ত করেন।

২৬. নেমেসিজ (Nemesis) : এক দেবী। রাত্রির কন্যা। তিনি মানুষকে সুখ, দুঃখ এবং উদ্ধতদের শাস্তি প্রদান করেন।

২৭. প্যান (Pan) : মেষপালকদের দেবতা। তিনি মধুমক্ষিকাদের রক্ষক এবং মৎস্য ও পশুশিকারের পৃষ্ঠপোষক। তিনি শৃঙ্গধারী, ছাগপদ ও লাঙ্গুল বিশিষ্ট।

২৮. প্যান্ডোরা (Pandora) : জুপিটারের আদেশে ভলকান কর্তৃক সৃষ্ট পরমা সুন্দরী প্রথমা নারী। জুপিটার একটি পাত্রে সকল প্রকার দুর্বিপাক আবদ্ধ করে তাকে পাত্রটি প্রদান করেন। তিনি কৌতূহলী হয়ে তা দেখতে গেলে সমস্তই বের হয়ে পড়ে। কেবল আশা পাত্রের মধ্যে থাকে। সেই কারণে মানুষের জীবনে বহু দুর্বিপাক আছে আর তার সঙ্গে মানুষের জীবনে আশাও আছে।

২৯. ক্লোথো (Clotho) : ভাগ্যদেবীগণের মধ্যে তিনি সর্বকনিষ্ঠ। জীবনসূত্র প্রস্তুত করাই তার কাজ।

৩০. ক্লোরিস (Cloris) : পবন দেবতার স্ত্রী; গ্রীকদের ফুলপরী।

www.pathagar.com

৩১. ওপস্ (Ops) : স্যাটার্নের স্ত্রী, কৃষিকার্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

৩২. ওরাইয়ন (Orion) : বিখ্যাত শিকারী দৈত্য। মৃত্যুর পরে তিনি নক্ষত্রমণ্ডলে স্থান লাভ করেন। ভারতে এ নক্ষত্রকে 'কালপুরুষ' নামে অবিহিত করা হয়।

৩৩. কেরন (Charon) : দৈত্য বিশেষ। মানুষ মরে গেলে তিনি তাকে নরকের পথে বিদ্যমান স্টাইক ও একিরণ নামীয় নদীর পাড়ে নিয়ে যান।

৩৪. এরিবাস (Erebus) : যমপুরীর অন্যতম দেবতা। যমপুরীর মধ্যে বিদ্যমান অন্ধকারকেও এ নামে অভিহিত করা হয়।

৩৫. হাইমেন (Hymen) : বিবাহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

৩৬. হিবি (Hebe) : জুপিটার ও জুনোর কন্যা। ইনি যৌবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

৩৭. শমাশ বা শিম্‌শ : সূর্যদেব।

৩৮. সিন : চন্দ্রদেবতা।

৩৯. ঈবা আয়া : বরুণদেব।

৪০. অণু : অন্ধকার, আকাশ ও তারকারাজির দেবতা।

৪১. ইশতার : প্রেম, সৌন্দর্য বা শুক্রগ্রহের প্রতীক।

৪২. অনলীল : মাটির দেবতা।

৪৩. বেলিত : শক্তির দেবী।

৪৪. নরগাল : যুদ্ধ ও বিক্রমের দেবতা ও মঙ্গল-গ্রহের প্রতীক।

৪৫. মরদুক : আলোকের দেবতা ও বুধ-গ্রহের প্রতীক।

৪৬. হবারে (Hvare) : সূর্যদেবতা।

৪৭. হেলিওস (Helios) : সূর্যদেবতা।

৪৮. শবর : সূর্যদেবতা।

৪৯. নাটসেস (Natches) : সূর্যদেবতা।

৫০. ইনকাস (Incas) : সূর্যদেবতা।*

---

* Smiun Clotrs History of the world IF, Page 105—109.

www.pathagar.com

উপজাতীয়দের মূর্তিপূজা

পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই দেশের 'আদিম অধিবাসী' বা 'উপজাতীয়' বলে পরিচিত এক শ্রেণীর মানুষ রয়েছেন। শিক্ষা-দীক্ষার অভাব, পশ্চাৎমুখীতা এবং রক্ষণশীলতার কারণে তাঁরা নিজদের আধুনিক সভ্য সমাজ থেকে কঠোরভাবে দূরে রেখেছেন। ফলে সেই আদিম যুগ থেকে বংশানুক্রমিকভাবে চলে আসা ধারণা-বিশ্বাস এবং প্রথাপদ্ধতি আজও তাঁদের মধ্যে অক্ষুণ্নভাবে চালু রয়েছে আর জাতীয় ঐতিহ্য হিসেবে সেটাকেই তাঁরা অত্যন্ত কঠোরভাবে আঁকড়ে ধরে রয়েছেন। বলাবাহুল্য, তাঁদের মধ্যে প্রচলিত দেবদেবী এবং মূর্তিপূজাই এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয়।

কিন্তু অসুবিধা হলো— তাঁদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন নামে বহু দল গোত্র প্রভৃতি রয়েছেন এবং তাঁদের বিশ্বাস এবং প্রথা-পদ্ধতির মধ্যেও বহু তারতম্য রয়েছে। সকলের কথা পৃথক পৃথকভাবে তুলে ধরতে হলে বিরাট একখানা পুস্তক লিখার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আপাতত তা সম্ভব নয়। স্থানাভাববশত এখানেও দু'চার কথা বলেই প্রসঙ্গের ইতি টানতে হচ্ছে। আলোচনা সংক্ষেপে করার জন্যে নমুনাস্বরূপ এখানে তিনটি মাত্র উপজাতীয় সম্পর্কেই আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখা হবে।

নিম্নে প্রথমে উপজাতীয় সম্প্রদায়ের নাম পরে তাদের ভাষায় তাদের বিশ্বস্ত প্রধান প্রধান দেবদেবীর নাম ও বন্ধনীর মধ্যে সেসবের বাংলা প্রতিশব্দ দেয়া হলো।

(ক) টিপরা সম্প্রদায়

১. তুইবুকমা (জলদেবী)।
২. কের, খরাংগমা (রোগব্যাধি, মহামারী প্রভৃতির দেবী)।
৩. খুরুক সোনাই (মাথা ধোয়ার দেবতা)।
৪. হানুক মানো জনাইনাই (বিশ্বদেবতা)
৫. বুরহাসা (প্রধান দেবতা।)
৬. চোংগ গ্রাংগমা (বুর হাসার স্ত্রী)।
৭. কামিনী (গ্রামদেবতা)।
৮. মুলিখানাই (গর্ভ নষ্ট হওয়া ও মৃত সন্তানের জন্ম থেকে রক্ষাকারী দেবী)।
৯. ছলংগতাই (নির্বুদ্ধিতা থেকে রক্ষাকারী দেবী)।

www.pathagar.com

১০. মালাংগতুই (বোকামি থেকে রক্ষাকারী দেবী)।
১১. সাকজা কবী (হটকারিতা থেকে রক্ষাকারী দেবী)।
১২. বাইবারী (গঞ্জনা থেকে রক্ষাকারী দেবী)।
১৩. খাহমালী (সহজভাবে বোঝানোর দেবী)।
১৪. হমালী (অনিষ্ট থেকে রক্ষাকারী দেবী)।
১৫. মাইলুংমা (শস্য দেবী)।
১৬. খুলুমরু (কার্পাস দেবী)।
১৭. হাকামা (রণদেবী)।
১৮. বিশচিনি শামুংগ (ভাগ্য বা লক্ষ্মীদেবী)।

(খ) চাকমা সম্প্রদায়

১. ধানফং (জুম চাষে সাফল্যদানের দেবতা)।
২. চুঙ্গুলাং (পরম পুরুষ বা পরম দেবতা)।
৩. পরমেশ্বরী (সন্তান সন্ততি, বিবাহ, গৃহশান্তি, ফসল বৃদ্ধি প্রভৃতির দেবী)।*
৪. ভাদ্যা (ভাত দেয়া থেকে উৎপত্তি। মৃত স্বজনদের ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্যে এ পূজা করা হয়ে থাকে)।

(গ) লুসাই সম্প্রদায়

১. কাংগপুইজাম (রোগ-ব্যাধি বাড়ানোর দেবতা)।
২. সিক (বন্ধ্যা নারীকে সন্তান দানকারী দেবতা)।
৩. সাঙ্খুয়া (মৃত পুরুষদের আত্মার মঙ্গলকারী দেবতা)।
৪. খাল (হোয়াই বা অপদেবতাদের কোপ দৃষ্টি থেকে রক্ষাকারী দেবতা)।
৫. দাউদ উল (বন-জঙ্গল, পাহাড়, নদ-নদী প্রভৃতির বিপদ থেকে রক্ষাকারী দেবতা)।
৬. রাতেক (ফসল বৃদ্ধি ও পোকা-মাকড় থেকে শস্য-রক্ষাকারী দেবতা)।

স্থানাভাববশত এখানেই ইতি টানা উচিত ছিল। কিন্তু তা করা হলে সুধী পাঠকবর্গের অনেকেই প্রকৃত অবস্থাটা উপলব্ধি করতে পারবেন কিনা সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকায় বাধ্য হয়ে সুলেখক এবং উপজাতীয়দের সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ আবদুস সাত্তারের "আরণ্য সংস্কৃতি" নামক গ্রন্থের কিছুটা অংশ উপহারস্বরূপ পাঠকবর্গের সম্মুখে তুলে ধরতে হলো :

উক্ত গ্রন্থের ৪৩ পৃষ্ঠায় বহু তথ্য প্রমাণাদি তুলে ধরার পরে তিনি লিখেছেন— "চন্দ্র ও সূর্য ছাড়াও আদিবাসী সমাজের ধর্ম ও বিশ্বাসে আকাশ, পৃথিবী, গ্রহ-নক্ষত্র, নদ-নদী পাহাড় পর্বত, পশুপাখি, জীবজন্তু, অগ্নি, বায়ু ইত্যাদি সব কিছুর অন্তরালে আত্মাধারী দেবদেবীর অস্তিত্ব বর্তমান। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, পৃথিবী সৃষ্টির মূল আধার বা নায়ক সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব

* চুঙ্গুলাং ও পরমেশ্বরী সঙ্গমে লিপ্ত হয়। বৃষ্টির আকারে বীর্যপাত হতে থাকে। ফলে পৃথিবী মাতা উর্বরা হয়ে ওঠেন প্রচুর শস্যসম্ভারে মাঠ ভরে যায় চাকমারা গভীরভাবে এ বিশ্বাস পোষণ করেন। ঋক্‌বেদের একটি সূক্তের সাথে এ বিশ্বাসের মিল রয়েছে।

www.pathagar.com

সন্ধানে আদিম সমাজ যতটা না ব্যাপৃত থেকেছে তার চেয়ে বেশি ব্যাপৃত থেকেছে প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের রহস্য উদ্ঘাটনে।

কেননা, এর অন্তরালে ক্রিয়াশীল ছিল ভয়। এবং এ ভয়ের পটভূমিকাতেই জন্মলাভ করেছে বিচিত্র ধরনের দেবদেবী। অবশ্যি এর সঙ্গে সংযুক্ত ছিল পূর্ব-পুরুষদের মৃত আত্মার ভয়। ফলে সৃষ্টিকর্তা, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, আকাশ, পৃথিবী ইত্যাদির অন্তরালে কল্পিত দেবদেবী তাদের পূজা অর্চনার যতটা না প্রাধান্য পেয়েছে তার চেয়ে বেশি প্রাধান্য পেয়েছে গ্রামদেবতা এবং গ্রামদেবী।

গ্রামদেবতা বা গ্রামদেবীর আধিপত্য আদিম সমাজে অধিক মাত্রায় বিদ্যমান। উল্লেখযোগ্য যে, গ্রাম-দেবদেবীরা আসলে পূর্বপুরুষ এবং প্রকৃতির বিভিন্ন পর্যায়ের অন্তরালে অদৃশ্য আত্মা (Spirit Being) এবং তাদের সঙ্গে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভয়-ভীতি জড়িত।

বাংলাদেশের আদি সমাজের গ্রাম-দেবদেবীদের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের লুসাই-কুকিদের হোয়াই (রাম হোয়াই এবং তুই হোয়াই) এবং সিলেটের খাসীয়াদের উব্লাই মূলুক, উব্লাই উমুতং, উব্লাই সংসপাই, উরিং, কেউ, কারিহ ও কাথলাম সম্পর্কে আগেই ইঙ্গীত দেয়া হয়েছে।

অন্যান্য সমাজের গ্রাম-দেবদেবীদের মধ্যে মুরু ও মুরংদের ওরেং ও সুংতিয়াং; সেন্দুজদের খোজিং; খুমীদের নদগ ও বোগলে; টিপরাদের চুয়া মাখলায়ে, হাকাকা, খুলুমরু, কালাইয়া-গরাইয়া, বুরসার, মাতাই চাংগরামু, কিচকিনি, সামুং, তুইমা; চাকমাদের মালক্ষী, বৃহত্তারা, ধলধুরি, পরমেশ্বরী, সত্যা, হাত্যা, ফুলকবরী, মেরুকোমরী মোহিনী কালা খেদর, ভূত, রাখ্যেয়াল, বিয়াত্রা, থান, চাল্লোয়াদে, বজমপতি, থাম্মাং, চেক্কং, মগনী, শিজি, কালী জান্দর, আনেকা, লাওজ্যা ঠাকুর ইত্যাদি।

গারোদের তাতার রাকুনা, নস্তনুপাস্তু, নাচি, সালজং, ছোছুম, নোরিংগ্রো, নোজিংজু, গোয়েরা, নোরিচিত, কিমরীবোত্তী, মেন, আছিমাদিংছিমা, কালকেম, চোরাবুদি, রোকিম, মিসি আগ্রাং, সোলজং ইত্যাদি। হিন্দু প্রভাবান্বিত আদিম সমাজ যেমন হাজ্য, দলুই, হদি, বোনা, রাজবংশী প্রভৃতিদের চণ্ডী, শীতলা, মনসা, রুকিনী, ভাদু, করম, পলাশাই, হিঙ্গুলাই, মেলাই সেপাই, চেতাই, বাশুলী, বরাহী কামার, বুড়ি, ডাকিনী, যুগিনী, হিড়ামাই প্রভৃতির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বলা আবশ্যক যে, হিন্দুদের দেবদেবী এবং আদিম সমাজের দেবদেবী অনেক ক্ষেত্রেই অবিচ্ছেদ্য সূত্রে আবদ্ধ।

অতঃপর উক্ত গ্রন্থের ৯৬ পৃষ্ঠায় প্রস্তরপূজা ও হিন্দুসমাজের অম্বুবাচী উৎসবের সাথে উপজাতীয়দের গভীর সম্পর্কের কথা তুলে ধরতে গিয়ে তিনি লিখেছেন :

www.pathagar.com

"প্রস্তরপূজা আদিম সমাজের আদিমতম নিদর্শন এবং খাসীয়া সমাজই সেই বৈশিষ্ট্যের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। বাংলাদেশের গারো, সেন্দুজ, পাঙ্খো, বনযোগী প্রভৃতি সমাজেও প্রস্তরপূজার ধারা অব্যাহত থাকলেও খাসীয়া সমাজে এটা প্রকট। তাদের এ রীতি প্রস্তরযুগ (Stone Age), নিরক্ষর যুগ (Pre-literate Age) এবং ক্রোম্যাগণন মানবের যুগ (Cro-Magnon Age)-এর কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।"

অম্বুবাচী খাসীয়াদের জাতীয় উৎসব। আসামের কামাখ্যা মন্দিরে এ উৎসব বিশেষ ঘটা করে পালন করা হয়। খাসীয়া ভাষায় "কা-মেইখা"-এর অর্থ "মায়ের জলধারা"। 'কা-মেইখা' থেকেই কামাখ্যা শব্দের উৎপত্তি বলে খাসীয়াদের ধারণ।

জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণপক্ষের ১০ম দিবস থেকে ১৩শ দিবস পর্যন্ত এ কামাখ্যা মন্দিরের পাশ দিয়ে লাল পানি নির্গত হয়। এতে পৃথিবী মাতা ঋতুবতী হয়েছেন বলে তাদের বিশ্বাস। এ তিন দিন হাল-কর্ষণ, শস্য বোনা এবং সাংসারিক অন্যান্য কাজও নিষিদ্ধ।

নৃত্যগীত ও আনন্দের মাধ্যমে খাসীয়া সমাজ এ দিনগুলো কাটানোর পর পৃথিবী মাতার শূচিতা ফিরে আসলে তারা যার যার গৃহে প্রত্যাবর্তন করে।

শুধু খাসীয়া সমাজ নয়— আসামের আবর, মিসমী, লাখের, মিরি প্রভৃতি আদিম সমাজও এ-বিশ্বাস থেকে মুক্ত নয়। হিন্দুসমাজ অম্বুবাচীর চতুর্থ দিবসে কতকগুলো প্রস্তর খণ্ড পৃথিবী মাতার প্রতিভূ কল্পনা করে তাদের স্নান করিয়ে ফুল, চন্দন, তেল ও মাল্যভূষিত করে এবং এভাবেই পৃথিবী মাতা শূচিত্ব প্রাপ্ত হয় বলে তাদের ধারণা।

বাংলাদেশ ও ভারতের রাঁচী অঞ্চলের ওরাওঁ সমাজ একই বিশ্বাসের অনুকরণে— 'হরি আরি' পূজা ও উৎসব পালন করে, হরি আরি উৎসবে আকাশদেবতার সঙ্গে পৃথিবীমাতা বা ধরতীমাই-এর বিবাহ কল্পনা করা হয়।

এ বিবাহ কল্পনা করার উদ্দেশ্যই যাতে পৃথিবী উর্বরা এবং উৎপাদিকা শক্তি অর্জন করতে পারে। কাজেই ধরমেশ বা প্রধানদেবতার সঙ্গে পৃথিবী মাতার বিবাহ ওরাওঁ সমাজে উর্বরতার প্রতীক (Fertility culf)।

" .... ছোট নাগপুরের খাড়োয়ারদের মুচুকরাণী উৎসব একই অর্থ জ্ঞাপন করে। মুচুকরাণী উৎসবেও খাড়োয়ারেরা এক খণ্ড লম্বা পাথরকে স্ত্রীলোক কল্পনা করে অন্য আরও এক খণ্ড পাথরের সঙ্গে বিবাহ দেয়। এ বিবাহ ও পৃথিবীমাতার সঙ্গে সৃষ্টিকর্তা বা প্রধান দেবতার বিবাহ বলে ধরে নেয়া হয়।"

এখানে বলা আবশ্যক যে, শুধু অম্বুবাচী, প্রস্তর ও মূর্তিপূজা, দেবদেবী, অপদেবতা, গ্রামদেবতা, ভূত-প্রেত প্রভৃতির প্রতি বিশ্বাস পোষণের দিক দিয়েই

www.pathagar.com

নয়, ধর্ম এবং বিশ্বাসের বেলায়ও প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই উপজাতীয়দের সাথে হিন্দুসমাজের যথেষ্ট মিল থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ এ-সম্পর্কে আর দুটিমাত্র বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করা যাচ্ছে।

লক্ষণীয় যে হিন্দুসমাজ সব কিছুর মূলাধার এবং সর্বশক্তিমান ও সার্বভৌম ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিপতি হিসেবে একজন ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস পোষণ করেন; আবার প্রতিটি কাজের পশ্চাতে কোনও না কোনও দেবদেবী, অপদেবতা, গ্রামদেবতা ভূত-প্রেতাদির কর্তৃত্ব থাকার প্রতিও বিশ্বাস পোষণ করেন।

উপজাতীয়দের মধ্যে অনুরূপ বিশ্বাস বিদ্যমান থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। তারাও যে সকল কাজের মূলে কোনও না কোনও দেবদেবী, অপদেবতা, গ্রামদেবতা, ভূত-প্রেতাদির কর্তৃত্বের প্রতি বিশ্বাসপরায়ণ ইতোপূর্বে সেসম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

অতঃপর তারাও যে, সবকিছুর মূলাধার এবং সর্বশক্তিমান হিসেবে একজন প্রধান দেবতার প্রতিও বিশ্বাস পোষণ করেন তার প্রমাণ তুলে ধরা যাচ্ছে।

এজন্যে আমরা প্রথমে এক একটি উপজাতীয় সম্প্রদায়ের নাম এবং পাশাপাশি তাদের ভাষায় সেই ঈশ্বর বা প্রধান দেবতার নাম তুলে ধরবো।

বাংলাদেশের কুকি, লুসাঈ ও খুমীদের কাছে সেই সৃষ্টিকর্তা বা প্রধানদেবতার নাম পাথিয়ান; মুরংদের তুরাই; সেন্দুজ, পাঙ্খো ও বনযোগীদের পত্যেন; খাসীয়াদের উব্লাই নবং খউ; গারোদের তাতারা রাবুগা; সাঁওতালদের ঠাকুর জিয়ো; ওঁরাওদের ধরমেশ; চাকমা, মগ, হাজং, হদি, টিপরা, রাজবংশী প্রভৃতির ঈশ্বর বা পরমেশ্বর ইত্যাদি।

আমাদের দ্বিতীয় বিষয়টির নাম 'পৌরোহিত্যবাদ'। ইতোপূর্বের বিস্তারিত আলোচনা থেকে আমরা হিন্দুসমাজের ব্রাহ্মণ্যবাদ বা পৌরোহিত্যবাদ-এর কথা জানতে পেরেছি। ব্রাহ্মণরাই যে উক্ত সমাজের ধর্মীয় বিধি-নিষেধাদির প্রবর্তন ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পরিচালনার কাজকে সম্পূর্ণরূপে নিজেদের আয়ত্ত্বাধীন ও অধিকারভুক্ত করে রেখেছেন তার নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রমাণাদি সেখানে তুলে ধরা হয়েছে।

উপজাতীয়দের মধ্যেও সেই একই অবস্থা বিরাজমান থাকতে দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ আমরা অতঃপর এক একটি উপজাতীয় সম্প্রদায়ের নাম লিখবো এবং পাশাপাশি তাদের ভাষায় ব্রাহ্মণ বা গুরুদেবকে ওদের ভাষায় কি বলা হয় তা তুলে ধরবো।

কুকি ও লুসাইরা তাদের ভাষায় ব্রাহ্মণকে বলেন থেমপু; খাসীয়ারা লাংদুহ; রাজবংশী, হাজং, দালুই, হদি প্রভৃতিরা ঠাকুর; টিপরারা আজোই বা আচাই; গারোরা কমল; ওঁরাওরা নাগমেতিয়া প্রভৃতি।

www.pathagar.com

ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা প্রভৃতি দেশের উপজাতীয়রা তাদের ব্রাহ্মণ বা গুরুপদবাচ্য ব্যক্তিদের শামান (Shamen), মেডিসিন-ম্যান (Medicine-man), আংগাকাক (Angakak) প্রভৃতির কোনও না কোনও একটা বলে অভিহিত করে থাকেন।

আদিম সমাজের অতি-প্রাকৃতে বিশ্বাসের মূল সূত্র কি? এ প্রশ্নের উত্তরে আরণ্য সংস্কৃতির প্রণেতা উক্ত গ্রন্থের ২০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন "আদিম সমাজ-জীবন সংগ্রামে টিকে থাকতে গিয়ে যখন দেখেছে, প্রকৃতির অন্তরালে অদৃশ্য শক্তির কাছে তারা বড়ো অসহায় তখনই তারা হাত বাড়িয়েছে অদৃশ্য শক্তির (Unseen forces) কাছে।

কেননা জন্ম-মৃত্যু, রোগ-জরা, ভয়-ভীতি ইত্যাদি তাদের আয়ত্ত্বের বাইরে এবং নিশ্চয়ই এসব অদৃশ্য শক্তির দ্বারা পরিচালিত। তাই সে অদৃশ্য শক্তির অন্বেষণ করতে গিয়ে গোটা প্রকৃতিই তাদের কাছে পূজার উপজীব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং এজন্যেই আদিম সমাজকে প্রকৃতির পূজারী বা জড়োপাসক বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ইংরেজিতে যাকে বলা হয় 'অ্যানিমিজম' (Animism)।

স্থানাভাববশত উদ্ধৃতির সংখ্যা বাড়ানো আর সম্ভব হচ্ছে না বলে এখানে শুধু বাংলাদেশে বসবাসকারী উপজাতীয়দের কয়েকটি মাত্র সম্প্রদায়ের কথা অতি সংক্ষেপে তুলে ধরতে হলো। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের উপজাতীয় সম্প্রদায়গুলো ধর্মীয় বিশ্বাস এবং পূজা-প্রার্থনাদি সম্পর্কে কিছুই বলা সম্ভব হলো না।

তবে এ সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকেই উপজাতীয় সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে প্রচলিত ধর্মীয় বিশ্বাস এবং মূর্তিপূজা সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণায় উপনিত হওয়া সম্ভব হবে আশা করি। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে আগ্রহী রয়েছেন এমন পাঠকদের আরণ্য-সংস্কৃতি বা এ ধরনের অন্যান্য গ্রন্থাদি পাঠ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

এসব উপজাতীয় মানুষেরা প্রায় সকলেই সাধারণত বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত এবং আধুনিক সভ্য-শিক্ষিতসমাজ থেকে দূরে অবস্থান করেন, নিদারুণ পশ্চাৎপদতা এবং সুকঠিন রক্ষণশীলতার কারণে তাদের অধিকাংশই আধুনিক শিক্ষা-সভ্যতাকে ভয় করেন এবং সর্বপ্রযত্নে সেই পরিবেশ থেকে নিজেদের দূরে রাখেন। তাদের অধিকাংশই যে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-সভ্যতার ধারে কাছেও যান না তার প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীও আমরাই। এসব কারণে আধুনিক সভ্য-শিক্ষিত মানুষেরা প্রায় সকলেই যে এ সব উপজাতীয়দের অসভ্য বর্বর প্রভৃতি বলে অভিহিত করেন সেটাও আমাদের অজানা নেই।

www.pathagar.com

এ তথাকথিত বর্বর ও অসভ্যদের ধর্মীয় বিশ্বাস, ধর্মীয় প্রথা-পদ্ধতি এবং ধর্মীয় আচারানুষ্ঠানাদির সাথে সুসভ্য ও সুশিক্ষিত হিন্দুসমাজের এ মিল দেখে কেউ যদি মনে করেন যে হিন্দুসমাজ অন্যান্য দিক দিয়ে যত উন্নতি-অগ্রগতিই সাধন করুক না কেন অন্তত ধর্মীয় বিশ্বাস, ধর্মীয় প্রথা-পদ্ধতি এবং ধর্মীয় আচারানুষ্ঠানাদির দিক দিয়ে তাঁরা খুব বেশি দূর অগ্রসর হতে পারেন নি এমনকি কোনও কোনও ক্ষেত্রে এ অসভ্য বর্বরদের প্রায় সমপর্যায়েই রয়ে গিয়েছেন তা হলে তাকে খুব বেশি দোষ দেয়া যায় কিনা চিন্তাশীল ও নিরপেক্ষ সুধীমণ্ডলীর কাছে গভীরভাবে সেকথা ভেবে দেখার সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে এ প্রসঙ্গের ইতি টানছি।

মূর্তিপূজার প্রাচীনত্ব

একথা বলাই বাহুল্য যে 'মূর্তিপূজার গোড়ার কথা' জানতে হলে মূর্তিপূজার প্রাচীনত্ব বা এখন থেকে কতদিন পূর্বে এই পৃথিবীতে মূর্তিপূজার সূচনা বা গোড়াপত্তন হয়েছিল অতি অবশ্যই সেকথা আমাদের জানতে হবে। অথচ বিষয়টি অত্যন্ত জটিল এবং ভীষণভাবে তমসাচ্ছন্ন। জটিল এবং তমসাচ্ছন্ন এজন্যেই বলা হলো যে—

০ কবে, কখন এবং কিভাবে মূর্তিপূজার সূচনা হয়েছিল তার নির্ভরযোগ্য কোনও প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

০ প্রায় সকল দেশের মূর্তিপূজার প্রবর্তক বা প্রবর্তকেরাই মূর্তিপূজা সম্পর্কীয় যেসব বিবরণ রেখে গিয়েছেন তা শুধু অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য এবং প্রত্যক্ষ সত্যের বিপরীতই নয়— ভীষণভাবে বিভ্রান্তিকরও।

০ পৃথিবীর সকল দেশে একই সময়ে এবং একই সঙ্গে মূর্তিপূজার উদ্ভব ঘটেনি। সুতরাং সকল দেশের মূর্তিপূজা সমানভাবে প্রাচীন হতে পারে না। এমতাবস্থায় পৃথিবীর কোন মূর্তিসমূহ সর্বপ্রথম নির্মিত ও পূজিত হয়েছিল তা নির্ণয় করা শুধু ভীষণভাবে কষ্টসাধ্যই নয়— অসম্ভবও।

০ কঠোর ধৈর্য ও প্রচেষ্টার সাহায্যে যদি এসব জটিলতা এবং ধুম্রজাল অপসারিত করা সম্ভবও হয় এবং অদ্ভুত অবিশ্বাস্য ও হেঁয়ালিপূর্ণ বিবরণসমূহের মধ্যে যদি কিছু সত্য নিহিত থেকেও থাকে তবে সেগুলোকে বিশাল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে উদ্ধার করে আনা এবং এই ক্ষুদ্র পুস্তকে তুলে ধরা কোনওক্রমেই সম্ভব হতে পারে না।

www.pathagar.com

অথচ 'মূর্তিপূজার গোড়ার কথা' জানা আমাদের প্রয়োজন। অন্যথায় এ পুস্তক লিখা যে একান্তরূপেই তাৎপর্যহীন এবং পণ্ডশ্রম মাত্র সেকথা খুলে বলার অপেক্ষা রাখে না।

আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা রয়েছে যে একমাত্র ভারতীয় হিন্দুসমাজ ছাড়া পৃথিবীর আধুনিক সভ্য-শিক্ষিত দেশসমূহের কোথাও আজ আর এ ধরনের মূর্তিপূজা বিদ্যমান নেই।

অতএব প্রথমে আমরা ভারতীয় হিন্দুসমাজের মূর্তিপূজার প্রাচীনত্ব নির্ণয়ে ব্রতী হবো— এবং পরে অন্যান্য কয়েকটি দেশের প্রতি দৃষ্টি ফেরাবো। তবে পৃথিবীর যে দেশটির মূর্তিপূজা সর্বাধিক প্রাচীন অন্য কথায় পৃথিবীতে মূর্তিপূজার সূচনাকারী দেশ কোনটি তা নির্ণয়ের প্রতি আমাদের বিশেষ মনোযোগ নিবদ্ধ থাকবে।

এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে, একাজে প্রচণ্ড ধরনের কতিপয় বাধা মাথাচাড়া দিয়ে রয়েছে। সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিবর্গকে মূল আলোচনায় অংশগ্রহণের পূর্বে অতি অবশ্যই এ বাধাগুলো সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। অন্যথায় প্রকৃত সত্যে উপনিত হওয়া কোনওক্রমেই সম্ভব হয়ে উঠবে না। অতএব প্রথমেই সেসম্পর্কে আলোকপাত করা যাচ্ছে।

এ কাজে প্রথম ও প্রধান বাধা হলো : মূর্তিপূজার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে জনমনে গড়ে তোলা এবং কঠোরভাবে বদ্ধমূল হয়ে পড়া নিদারুণ ভ্রান্ত ধারণার বিদ্যমানতা।

উল্লেখ্য, মূর্তিপূজাকে সত্য, সনাতন এবং বিধি-সম্মত বলে চিরস্থায়ীভাবে সমাজের বুকে প্রতিষ্ঠাদানের উদ্দেশ্যেই স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট মহল এর প্রাচীনত্ব প্রমাণের প্রয়োজন বোধ করেছিলেন।

তারা জনসাধারণকে এটাই বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, কোনও কিছুর সত্য, সনাতন এবং বিধিসম্মত হওয়ার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হলো তার প্রাচীনত্ব বা সুদীর্ঘকাল ধরে চালু থাকা। যেহেতু মূর্তিপূজা প্রাচীনকাল থেকে অব্যাহতভাবে চালু রয়েছে— অতএব এটা সত্য, সনাতন এবং বিধিসম্মত না হয়ে পারে না।

স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহলের এ প্রচেষ্টা যে সফল হয়েছিল অদ্যাপি মূর্তিপূজা চালু থাকা এবং মূর্তিপূজার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে জনমনে বদ্ধমূল ভ্রান্তধারণার বিদ্যমানতাই সে-কথার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ বহন করছে।

অথচ অন্তত ভারতীয় হিন্দুসমাজের ক্ষেত্রে দেবদেবী, অপদেবতা, গ্রামদেবতা, ভূত-প্রেত প্রভৃতি সম্পর্কীয় ধারণা বিশ্বাস প্রাচীন হলেও সেই অনুপাতে মূর্তিপূজা যে মোটেই প্রাচীন নয় তার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ এ পুস্তকের 'পুরাণের দেবতা' শীর্ষক নিবন্ধ থেকে আমরা জানতে পেয়েছি।

www.pathagar.com

মূর্তিপূজার প্রাচীনত্ব প্রমাণের তাদের এ প্রচেষ্টা কিভাবে সফল হয়েছিল তার তিনটি মাত্র কারণকে নিম্নে পৃথক পৃথকভাবে তুলে ধরা যাচ্ছে।

০ বৈদিক, উপনিষদীয় এমনকি দ্বাপরযুগের শেষভাগেও যে মূর্তিপূজার উদ্ভব ঘটেনি এবং বেদ, উপনিষদ প্রভৃতি বিশ্বস্ততম ধর্মগ্রন্থসমূহ এবং প্রখ্যাত মুণি মহাপুরুষদের অধিকাংশই যে মূর্তিপূজাকে অন্যায়, অসার এবং মূর্খ ও অবিজ্ঞ-জনোচিত কাজ বলে কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন সাধারণ মানুষেরা সে-কথা জানতো না, জানার কথাও নয়।

মূর্তিপূজা প্রবর্তনে ইচ্ছুক ব্রাহ্মণদের প্রচেষ্টায় এটা চালু হওয়ার বেশ কিছুকাল পরে যাদের জন্ম হয়েছে তারা ভূমিষ্ট হওয়ার পর থেকে বংশানুক্রমিকভাবে এ-অনুষ্ঠান চালু থাকতে দেখেছেন এবং দূর থেকে হলেও এতে অংশগ্রহণ করেছেন। ফলে এটা যে সত্য, সনাতন এবং বিধিসম্মত অনুষ্ঠান হিসেবে আবহমানকাল ধরে চালু রয়েছে এমন একটা ধারণা তাদের মন-মগজে বদ্ধমূল হয়ে পড়া মোটেই বিচিত্র নয়।

০ মূর্তিপূজা যে আসল কাজ নয় বরং একত্ববাদী ধ্যান-ধারণায় উপনীত হওয়ার জন্যে প্রশিক্ষণমূলক একটি সাময়িক ব্যবস্থামাত্র সেকথা যাঁরা জানতেন তাঁদের মৃত্যুর পরে তাঁদের বংশধরেরা স্বাভাবিক নিয়মেই কালক্রমে সেকথা ভুলে গিয়েছেন। ফলে এটা যে সত্য, সনাতন, বিধিসম্মত অনুষ্ঠানরূপে আবহমান কাল ধরে চালু রয়েছে এমন একটা ধারণা তাঁদের মন ও মগজে সুদৃঢ়রূপে আসন গেড়ে বসার সুযোগ পেয়েছে।

০ পুরাণ জাতীয় ধর্মগ্রন্থসমূহ, কল্প-কাহিনী, চরিতামৃত, স্তব-মালা, গান, কবিতা, নাটক নভেল প্রভৃতি এবং সাড়ম্বর পূজানুষ্ঠানাদির মাধ্যমে মূর্তিপূজা সত্য, সনাতন, অপরিহার্য এবং আবহমান কাল ধরে চলে এসেছে এমন একটা ধারণা জনগণের মন-মানসে বদ্ধমূল করে তোলা হয়েছে।

এ কাজে তাঁরা কতদূর সফল হয়েছেন অতঃপর তার দুটি মাত্র বাস্তব ঘটনা নিম্নে তুলে ধরা যাচ্ছে।

প্রথমেই মূলতানের রক্তবর্ণের চর্মাবৃত এবং রক্তবর্ণের চক্ষু-তারকা বিশিষ্ট আদিত্য (সূর্য) দেবের কাষ্ঠমূর্তিটির কথা তুলে ধরা যেতে পারে। সর্বসাধারণের বদ্ধমূল বিশ্বাস মূর্তিটি 'কৃত্যযুগ'-এর শেষে স্থাপিত হয়েছে।

"আল বেরুনীর ভারত-তত্ত্ব" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে হিসেব করে দেখানো হয়েছে যে 'কৃত্যযুগ'-এর শেষে মূর্তিটি নির্মিত হয়ে থাকলে এখন থেকে তার সময়ের ব্যবধান দাঁড়ায় ২,১৬,৪৩২ বছর।

অথচ হিন্দুসমাজে মূর্তিপূজার সূচনা যে এখন থেকে পাঁচ হাজার বছরের উর্ধ্বে নয় তার অকাট্য প্রমাণ আমাদের হাতে রয়েছে এবং যথাস্থানে তা তুলে

www.pathagar.com

ধরা হবে। তাছাড়া এত দীর্ঘকাল কোনও কাষ্ঠমূর্তি অক্ষত অবিকৃত অবস্থায় থাকতে পারে কি না সেকথাও বিশেষভাবে ভেবে দেখা প্রয়োজন। অথচ এ-সম্পর্কে ভ্রান্তধারণা বদ্ধমূল থাকার কারণে কোনও দিনই সেকথা ভেবে দেখা হয় না।

দ্বিতীয় বাস্তব ঘটনাটি অম্বুবাচী উৎসব সম্পর্কে। এ উৎসবের কথা ইতোপূর্বে যথাস্থানে বলা হয়েছে। উৎসবের কথা বলা হলেও কাহিনীটিকে অবলম্বন করে এ উৎসবের আয়োজন সে কাহিনটি হলো :

আদিযুগে যখন পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবই ঘটেনি, শুধু দেবদেবী, দৈত্য-প্রেতাদির কাজ-কারবার চলছিল সেসময়ে পতির নিন্দা সহ্য করতে না পেরে দক্ষ রাজার কন্যা সতী দেহত্যাগ করেন।

ভগবান মহাদেব স্ত্রীর এ আকস্মিক মৃত্যু সংবাদে উম্মাদ হয়ে ছুটে আসেন। ক্রোধে প্রস্রাব করে শ্বশুরের যজ্ঞ ভাসিয়ে দিয়ে সতীর মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে ছন্নছাড়ার মত ঘুরে বেড়াতে থাকেন। সৃষ্টি ধ্বংসের আশঙ্কায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিচলিত হন এবং মহাদেবকে সম্মোহিত করেন। ফলে মহাদেব সতীর দেহ পরিত্যাগ করে হিমালয় পর্বতে গিয়ে কঠোর তপস্যায় রত হন।

সুযোগ বুঝে শ্রীকৃষ্ণ তার সুদর্শনচক্র দিয়ে সতীর মৃতদেহ খণ্ড বিখণ্ড করেন। একান্নটি খণ্ড চক্রের ঘূর্ণনে চারদিকে ছুটে যায় এবং ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পতিত হয়। এটাই 'একান্নপীঠ' বা তীর্থস্থান নামে খ্যাত। সতীর স্ত্রী অঙ্গটি কামাখ্যা পর্বতে পতিত হয়েছিল বলে বর্ণিত রয়েছে। এবং একথাও বর্ণিত রয়েছে যে প্রতিবছর জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণপক্ষের দশম দিবসে ঐ অঙ্গ থেকে সতীর ঋতুস্রাব হতে থাকে। বলাবাহুল্য, এ ঋতুস্রাবকে কেন্দ্র করেই কামাখ্যা (উক্ত স্ত্রী-অঙ্গটির) পূজা ও অম্বুবাচীর উৎসব পালিত হয়ে আসছে।

বলা আবশ্যক যে, উল্লিখিত স্ত্রী-অঙ্গটি প্রস্তরনির্মিত। কোথায় সতী আর কোথায় তাঁর এ প্রস্তর নির্মিত স্ত্রী-অঙ্গ! অথচ সেই কল্পযুগ থেকে নিয়মিতভাবে এ ঋতুস্রাব হয়ে চলছে বলে হিন্দুসমাজ এবং পার্বত্য উপজাতীয়দের মধ্যে গভীর বিশ্বাস বিদ্যমান থাকতে দেখা যায়।

উদাহরণের সংখ্যা আর না বাড়িয়ে শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট হবে বলে মনে করি, সেই আদিম কাল থেকে মূর্তিপূজা চালু রয়েছে বলে জনমনে গড়ে তোলা এ গভীর ভ্রান্তবিশ্বাসের বিদ্যমানতাকে অস্বীকার বা পাশকাটিয়ে যাওয়ার কোনও উপায়ই নেই। মূর্তিপূজকদের মন-মানস এবং কার্যকলাপের খবর রাখেন এমন ব্যক্তিমাত্রই এ গভীর ভ্রান্তবিশ্বাসের সাথে কম-বেশ পরিচিত রয়েছেন।

হাজার হাজার বছরে এবং পুরুষানুক্রমে মন-মগজে এমন অতীব গভীর হয়ে গেড়ে বসা এ ভ্রান্তবিশ্বাসের অপনোদন কিভাবে করা যায় সেটাই এখন আমাদের বিবেচ্য বিষয়।

www.pathagar.com

তবে মিথ্যার ধুম্রজাল যত প্রকাণ্ড এবং প্রচণ্ডই হোক সত্যকে সত্য করে এবং সার্থকভাবে তুলে ধরতে পারলে ওসব কিছুকে কাটিয়ে ওঠা যে সম্ভব অন্য কথায় সত্যের জয় যে অবশ্যম্ভাবী সে দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের রয়েছে। এ দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে সত্যকে সত্য করে তুলে ধরার প্রচেষ্টা আমরা চালিয়ে যাব। প্রকৃতই যারা সত্যানুসন্ধিৎসু এবং স্থির-প্রাজ্ঞ অন্তত তাঁরা যে এ-থেকে উপকৃত হবেন সে-আশাও দৃঢ়ভাবেই আমরা পোষণ করি।

অতঃপর মূর্তিপূজার প্রাচীনত্ব নির্ণয়ের একমাত্র না হলেও অন্যতম প্রধান উপায়টি সম্পর্কে আলোকপাত করা হবে। তবে এ উপায়টি সম্পর্কেও যে জনমনে প্রচণ্ড ধরনের ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে প্রথমেই সেকথা বলে রাখতে হচ্ছে।

অতএব সেই উপায়টি কি সেকথা বলার পরে যে ভ্রান্তধারণা সৃষ্টি করা হয়েছে সেসম্পর্কে আলোকপাত করা এবং সবশেষে পুরাণসমূহ কতদিনের প্রাচীন সেসম্পর্কীয় তথ্যাবলী তুলে ধরা প্রয়োজন।

আমাদের কথিত উপায়টি হলো— 'পুরাণসমূহের প্রাচীনত্ব নির্ণয়'। কেননা মূর্তিপূজা সংক্রান্ত যাবতীয় বিবরণ ও তথ্যাবলী একমাত্র পুরাণের মতো গ্রন্থসমূহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে দেখা যায়। অতএব পুরাণ প্রণয়নের সময়েই যে ওগুলোর রচনা এবং লিপিবদ্ধকরণের কাজ সমাধা করা হয়েছিল সেকথা অনায়াসেই বুঝতে পারা যাচ্ছে।

এমতাবস্থায় পুরাণসমূহের প্রাচীনত্ব নির্ণয়ই যে মূর্তিপূজার প্রাচীনত্ব নির্ণয়ের একমাত্র উপায় না হলেও অন্যতম প্রধান উপায় সেকথা বুঝতে পারা মোটেই কঠিন নয়।

কিন্তু মূর্তিপূজার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে ভ্রান্তধারণা সৃষ্টির মতো পুরাণসমূহের প্রাচীনত্ব সম্পর্কেও প্রচণ্ড ধরনের ভ্রান্ত-ধারণা সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে।

পুরাণসমূহের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে জনমনে গড়ে তোলা এ গভীর ভ্রান্ত-ধারণার দুটিমাত্র উদাহরণ নিম্নে তুলে ধরা যাচ্ছে :

০ পদ্ম পুরাণের সৃষ্টিখণ্ডে পুরাণশাস্ত্রকে সর্বশাস্ত্রের আদি, সর্বলোকের উত্তম, সর্বজ্ঞানের উৎপাদক, ত্রিবর্ণের সাধক, পবিত্র এবং শত কোটি শ্লোকে নিবদ্ধ বলা হয়েছে।

সেখানে একথাও বলা হয়েছে যে, লোক সকল নিঃশেষ হলে ব্রহ্মার আদেশে কেশব[১] বাজি[২] রূপে সমুদ্র থেকে পুরাণ আহরণ করেন।

---

১. শ্রীকৃষ্ণ, ২. ঘোড়া।

www.pathagar.com

০ অগ্নি পুরাণ দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলা হয়েছে, মৎস্য কুর্মাদিরূপধারী কালাগ্নিরুদ্ররূপী বিষ্ণুই ব্রহ্মেশ্বর এবং পুরাণই বিদ্যাসার। পুরাকালে ব্রহ্মবিদ্যাক্ষর পরম অগ্নি পুরাণ ও ভগবানের মৎস্যাদিরূপ ধারণের কারণ দেবদের বিষ্ণু বশিষ্ট মুণির এবং ব্রহ্মা দেবগণের নিকট বর্ণনা করেন।

পুরাণের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে ভ্রান্তধারণা সৃষ্টির উদাহরণ তুলে ধরাই এখানে আমাদের লক্ষ্য। অতএব এসব বিবরণের সত্যতা, বাস্তবতা প্রভৃতি সম্পর্কে কোনওরূপ মন্তব্য করার প্রয়োজন আমাদের নেই। আমরা শুধু সুধী পাঠকবর্গের উদ্দেশ্যে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাতে চাই যে, "পুরাণসমূহ অনাদিকাল থেকে বিদ্যমান রয়েছে" জনমনে এ ভ্রান্তধারণা সৃষ্টিই এসব বিবরণ প্রচারের লক্ষ্য কিনা গভীরভাবে সেকথা আপনারা ভেবে দেখুন। বলা আবশ্যক যে, শুধু পদ্ম এবং অগ্নি পুরাণই নয়— প্রতিটি পুরাণ এবং উপ-পুরাণই কেউবা নিজেকে লক্ষ কোটি বছরের, কেউবা কোটি কোটি বছরের পুরাতন বলে দাবি করছে। আবার কেউবা বিশ্বসৃষ্টির পূর্বেও বিদ্যমান থাকার দাবি জানাচ্ছে।

পুরাণসমূহ বেদব্যাস মুণির রচিত বলে যাঁরা দাবি করেন তাঁদের দাবি যে সত্য হতে পারে না এবং বেদব্যাস মুণির তিরোধানেরও বহু পরে যে এসব রচিত হয়েছে ইতোপূর্বে সেসম্পর্কে বহু প্রমাণ আমরা তুলে ধরেছি। অতঃপর এখন থেকে মোটামুটিভাবে কত দিন পূর্বে পুরাণসমূহ রচিত হয়েছে তার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কতিপয় প্রমাণকে নিম্নে পৃথক পৃথকভাবে তুলে ধরা যাচ্ছে :

০ পুরাণসমূহের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে বিশ্বকোষের অভিমত :

Purans (disordered geneologis of kings compounded with legends, Put in present form fourth country A. D. and latter) — Encyclopedia of World History by W. L. Langer, Page 43

ডব্লিউ, এল, লেঙ্গারের এ গবেষণা সঠিক হয়ে থাকলে ধরে নিতে হয় যে, যিশুখ্রিস্টের ৪০০ বছর পরে অর্থাৎ এখন থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে পুরাণ রচিত হয়েছে।

০ ড. বেদপ্রকাশ উপাদ্যায় এম. এ. (সংস্কৃত বেদ) রিসার্চ স্কলার, সংস্কৃত বিভাগ, প্রয়াগ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রয়াগ; তাঁর লিখিত "বেদ ও পুরাণের ভিত্তিতে ধর্মীয় ঐক্যের জ্যোতি" নামক গ্রন্থে বহু তথ্য প্রমাণাদি তুলে ধরে মন্তব্য করেছেন :

"অতএব পুরাণ রচনার সময়কাল প্রায় ২,৫০২ খৃঃ পূঃ হইতে ২,৫৬৩ খৃঃ পূর্বের মধ্যকাল হইবে।" — ঐ ১১ পৃঃ

www.pathagar.com

শ্রদ্ধেয় উপাধ্যায় মহাশয়ের গবেষণা সঠিক হলে ধরে নিতে হয় যে, এখন থেকে প্রায় ৩৫০০—৪০০০ বছর পূর্বে পুরাণ রচিত হয়েছে।

উল্লেখ্য, মহামুণি বেদব্যাস যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরেও জীবিত ছিলেন তার বহু অকাট্য প্রমাণ এ পুস্তকে ইতোমধ্যে আলোচিত হয়েছে।

আর কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ যে এখন থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল ইতিহাসের পাঠকমাত্রেরই সেকথা জানা রয়েছে। এ সম্পর্কীয় বহু তথ্য-প্রমাণও এ পুস্তকের যথাস্থানে তুলে ধরা হয়েছে।

'বেদব্যাস মুণি কর্তৃক পুরাণসমূহ প্রণীত হয়েছে' মহল বিশেষের এ দাবি সত্য হলে পুরাণসমূহের বয়স যে পাঁচ হাজার বছরেরও কম সেকথা বুঝতে বিলম্ব হয় না।

কিন্তু পুরাণসমূহ যে বেদব্যাস মুণি কর্তৃক প্রণীত হয়নি এবং হতে পারে না, বরং তার মৃত্যুর অনেক পরে অন্য কোনও ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ কর্তৃকই যে প্রণীত হয়েছে তার বহু অকাট্য প্রমাণ ইতোমধ্যে উল্লিখিত হয়েছে।

সে দিক থেকে বিবেচনা করা হলেও শ্রদ্ধেয় উপাধ্যায় মহাশয়ের গবেষণা সঠিক বলেই ধরে নিতে হয়। শুধু শ্রদ্ধেয় উপাধ্যায় মহাশয়ই নন তাঁর মতো অনেকেই পুরাণের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে প্রায় একই ধরনের অভিমত প্রকাশ করেছেন।

উদাহরণস্বরূপ মাত্র আর একজন প্রখ্যাত ও সর্বজনমান্য পণ্ডিত ব্যক্তির এ সম্পর্কীয় অভিমত তুলে ধরা যাচ্ছে। এ প্রখ্যাত ও সর্বজনমান্য পণ্ডিত ব্যক্তিটি হলেন— ভারতীয় আর্যসমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, বহু শাস্ত্রবিদ ও গবেষক মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী।

তিনি তাঁর রচিত "সত্যার্থ প্রকাশ" নামক গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে এ সম্পর্কীয় যেসব অভিমত ব্যক্ত করেছেন তার কয়েকটি মাত্র নিম্নে হুবহু উদ্ধৃত করা যাচ্ছে :

"মূর্তিপূজা এবং তীর্থ সনাতন কাল হইতে প্রচলিত আছে" এ দাবি খণ্ডন করতে গিয়ে সত্যার্থ প্রকাশের ৫৭০ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন :

".... যদি ইহা চিরকাল ছিল তবে বেদ এবং ব্রাহ্মণাদি ঋষি মুণি কৃত গ্রন্থসমূহে তাহার উল্লেখ নাই কেন? এই মূর্তিপূজা আড়াই অথবা তিনি সহস্র বৎসরের কাছাকাছি বাম মার্গী এবং জৈনদিগের দ্বারা প্রচলিত হইয়াছিল। প্রথমে আর্যাবর্তে ছিল না।"

"এসব তীর্থসমূহও ছিল না। যখন জৈনগণ গিরনার, পালিটানা শিখর, শত্রুঞ্জয় এবং আবু প্রভৃতি তীর্থ রচনা করিয়াছিল, সে-সময় পৌত্তলিকগণও সেই সব তীর্থের অনুকূলে তীর্থ রচনা করে।"

www.pathagar.com

"যদি কেহ এ সকলের আরম্ভ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছা করেন তবে তিনি পাণ্ডবদিগের অতি প্রাচীন খাতাপত্র এবং তাম্রলিপি প্রভৃতি দেখিবেন। তাহা হইলে ইহা নির্ণয় হইবে যে, এইসব তীর্থগুলো পাঁচশত অথবা একসহস্র বৎসরের এদিকেই রচিত হইয়াছে। সহস্র বৎসরের ওদিকের লেখা কাহারও নিকট দেখা যায় না। সুতরাং তীর্থগুলি আধুনিক।"

বেদব্যাস মণিকে যাঁরা পুরাণসমূহের প্রণেতা বলে দাবি করেন তাঁদের দাবিকে খণ্ডন করতে গিয়ে উক্ত গ্রন্থের ৫৭৭ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন :

"বেদব্যাস অষ্টাদশ পুরাণের কর্তা হইলে পুরাণগুলোতে এত অলীক গল্প থাকিত না। কেননা শারীরিক সূত্র, যোগশাস্ত্রের ভাষ্য প্রভৃতি ব্যাসোক্ত গ্রন্থসমূহ অবলোকন করিলে জানা যায় যে, ব্যাসদেব মহান বিদ্বান, সত্যবাদী, ধার্মিক যোগী ছিলেন। তিনি এমন মিথ্যা কথা কখনও লেখেন নাই।"

"এতদ্বারা সিদ্ধ হয় যে, যে-সকল সম্প্রদায়ী লোকেরা পরস্পর বিরোধী ভাগবতাদি নবীন কপোলকল্পিত গ্রন্থসমূহ রচনা করিয়াছে তাহাদের মধ্যে ব্যাসদেবের গুণের লেশমাত্রও ছিল না। আর বেদশাস্ত্রের বিরুদ্ধ অসত্য কথা লেখা ব্যাসদেবের ন্যায় বিদ্বান পুরুষের কার্য নহে। কিন্তু ইহা (বেদশাস্ত্র) বিরোধী, স্বার্থপর, অবিদ্বান ব্যক্তিদের কর্ম।"

উক্ত গ্রন্থের ৫৮০ পৃষ্ঠায়— "পুরাণের সকল কথাই কি মিথ্যা? না কোনও সত্যও আছে?" এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি লিখেছিলেন— "অনেক কথাই মিথ্যা। তবে ঘূর্ণাক্ষর ন্যায় অনুসারে সত্যও আছে। যাহা সত্য তাহা বেদাদি সত্য শাস্ত্রের। কিন্তু যাহা মিথ্যা তাহা পোপদের পুরাণরূপগৃহের। যথা **শিবপুরাণে** শৈবগণ শিবকে পরমেশ্বর মানিয়া বিষ্ণু, ইন্দ্র, গণেশ এবং সূর্যাদিকে তাঁহার দাস ঠিক করিয়াছেন। বৈষ্ণবগণ **বিষ্ণুপুরাণ** প্রভৃতিতে বিষ্ণুকে পরমাত্মা এবং শিব প্রভৃতিকে বিষ্ণুর দাস করিয়াছেন। **দেবী ভাগবতে** দেবীকে পরমেশ্বরী কিন্তু শিব এবং বিষ্ণু প্রভৃতিকে তাঁহার কিঙ্কর করিয়াছেন। **গণেশ খণ্ডে** গণেশকে ঈশ্বর এবং অবশিষ্ট সকলকে দাস করা হইয়াছে।"

"বলুন তো এ সকল কথা যদি এ সমস্ত সম্প্রদায়ী পোপদিগের না হয় তবে কাহাদের? যেকোন একজন সাধারণ ব্যক্তির রচনায় এমন পরস্পর বিরুদ্ধ কথা থাকিতে পারে না। এবং বিদ্বানদের রচিত হইলে এসকল কখনও থাকিতে পারে না। ইহাদের একটিকে সত্য স্বীকার করিলে অপরটি মিথ্যা হয়। আর যদি দ্বিতীয়টিকে সত্য স্বীকার করা হয়, তৃতীয়টি মিথ্যা, আবার তৃতীয়টিকে সত্য মানিলে অন্য সবগুলোই মিথ্যা হয়।"

এ পুস্তকের পুরাণ সম্পর্কীয় আলোচনা, বিশ্বকোষ এবং এ প্রখ্যাত ও সর্বজনমান্য পণ্ডিতপ্রবরের সুচিন্তিত অভিমতসমূহ অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করা

www.pathagar.com

হলে পুরাণের প্রাচীনত্ব সম্পর্কীয় এত কালের ধারণা যে বিভ্রান্তিকর এবং স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহলের কারসাজিরই ফল সেকথা সর্বসাধারণ বিশেষ করে সত্যানুসন্ধিৎসু এবং স্থিরপ্রাজ্ঞ মহলের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে বলে দৃঢ় আশা পোষণ করি।

মূর্তিপূজাকে যে বিশ্বস্ততম ধর্মগ্রন্থেসমূহ এবং অধিকাংশ মহাপুরুষ অসার এবং অবিজ্ঞজনোচিত কাজ বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন তার বহু তথ্য প্রমাণ এ পুস্তকের যথাস্থানে তুলে ধরা হয়েছে।

অতঃপর মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ সত্যার্থ প্রকাশের বিভিন্ন স্থানে হিন্দুসমাজে মূর্তিপূজার সূচনাকাল সম্পর্কে যেসব অভিমত ব্যক্ত করেছেন তার কয়েকটি মাত্র পাঠকবর্গের ভেবে দেখার জন্য অতঃপর হুবহু উদ্ধৃত করা যাচ্ছে :

মহর্ষি দয়ানন্দ তাঁর সত্যার্থে প্রকাশের ৫৭০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন—

"এসব তীর্থসমূহও ছিল না; যখন জৈনগণ গিরনার, পালিটানা শিখর, শত্রুঞ্জয় এবং আবু প্রভৃতি তীর্থ রচনা করিয়াছিল সে সময়ে পৌত্তলিকগণও সেই সব তীর্থের অনুবৃলে তীর্থ রচনা করে।"

বলাবাহুল্য, হিন্দু এবং জৈনদের তীর্থ রচনা যে একই সময়ের ঘটনা এ থেকে তার একটা সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে।

অতঃপর উক্ত গ্রন্থের ৮২০ পৃষ্ঠায় "মূর্তিপূজার প্রচলন জৈনদের মতবাদ হইতে হইয়াছে" শিরোনাম দিয়ে মূর্তিপূজা সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য-প্রমাণাদি তিনি তুলে ধরেছেন এবং উপসংহার টানতে গিয়ে দৃঢ়কণ্ঠে বলেছেন— "এখন দেখ! জৈনমত হইতেই মূর্তিপূজা সংক্রান্ত যাবতীয় কলহ-বিবাদ প্রচলিত হইয়াছে। ভ্রান্তি এবং অসত্যের মূলধারাও এই জৈনমত।"

ইতিহাসের পাঠক মাত্রেরই জানা রয়েছে যে জৈন মতবাদের প্রবর্তক 'বর্ধমান' যিশুখ্রিস্টের ৫২৭ বছর পূর্বে উত্তর বিহারের 'বৈশালী নগর' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। পরে তার নাম হয় 'মহাবীর।' ত্রিশ বছর বয়ক্রম পর্যন্ত সংসারধর্ম পালন করার পরে তিনি তপস্বী হন এবং বারো বছর পরে তিনি মহাবীর নাম ছাড়াও 'জিন' (রিপূজয়ী) এবং নির্গ্রন্থ (সংসার বন্ধনমুক্ত) নামে পরিচিত হন। প্রায় ত্রিশ বছর বিভিন্ন স্থানে স্বীয় মতবাদ প্রচারের পরে তিনি দেহত্যাগ করেন। বলাবাহুল্য, তাঁর 'জিন' নাম থেকে তার মতবাদে বিশ্বাসীদের 'জৈন' বলা হয়ে থাকে।

পরবর্তী সময়ের শিষ্য প্রশিষ্যরা যে মহাবীরের মূর্তি নির্মাণ ও সেই মূর্তির পূজানুষ্ঠানকে সর্বপ্রধান ধর্মীয় অঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন ইতিহাসের পাঠকমাত্রেরই সেকথাও জানা রয়েছে।

www.pathagar.com

মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীর মতে এটাই ছিল আর্যাবর্তের প্রথম মূর্তিপূজা এবং সাধারণ হিন্দুসমাজকে এর প্রভাব থেকে দূরে রাখার অভিপ্রায়েই যে এ সময় থেকে হিন্দুসমাজেও বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি নির্মাণ এবং পূজা উপাসনার কাজ শুরু হয়েছিল তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে সেকথাও ব্যক্ত করেছেন।

মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীর এ অভিমত নির্ভুল হলে আমাদের অবশ্যই ধরে নিতে হয় যে, এখন থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে জৈনদের সাথে সাথে হিন্দুসমাজেও মূর্তিপূজার গোড়া পত্তন হয়েছিল।

কিন্তু একটি বিশেষ কারণে তাঁর এ অভিমতকে আমরা পরিপূর্ণভাবে সমর্থন করতে পারছিনা। সেই বিশেষ কারণটি হলো : গৌতম বুদ্ধের গৃহত্যাগ এবং সন্যাসব্রত গ্রহণ।

মানুষের জড়া, ব্যাধি, মৃত্যু, বার্ধক্য প্রভৃতি এবং হিন্দুসমাজের জাতিভেদ প্রথা, মূর্তিপূজা ও অন্যান্য কদাচারই যে তাঁর মনোবেদনা এবং সংসারত্যাগের কারণ ইতিহাসের পাঠকমাত্রেরই সেকথা জানা রয়েছে। বৌদ্ধত্ব লাভের পরে তিনি যে তাঁর শিষ্যদের মধ্যে বিশেষ করে মূর্তিপূজার অসারতার কথাই দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করেছেন সেকথাও তাদের অজানা নয়।

ঐতিহাসিকদের হিসেব অনুযায়ী যিশুখ্রিস্টের ৫৬৮ বছর পূর্বে গৌতম বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন এবং আশি বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। এ হিসেবে জৈনধর্মের প্রবর্তক মহাবীরের জন্মের প্রায় চল্লিশ বছর পূর্বে গৌতম বুদ্ধের জন্ম হয়।

এ থেকে বুঝতে কষ্ট হয় না যে, গৌতম বুদ্ধ কর্তৃক বৌদ্ধধর্ম প্রচারে ব্রতী হওয়া এবং মহাবীরের সংসারত্যাগ প্রায় একই সময়ের ঘটনা।

এখন কথা হলো : মহাবীরের জন্মের প্রায় চল্লিশ বছর পূর্বে হিন্দুসমাজে মূর্তিপূজা চালু থাকতে দেখে গৌতম বুদ্ধ যদি ব্যথিত হয়ে থাকেন তবে মহাবীরের মৃত্যুর পরে তাঁর শিষ্যপ্রশিষ্যদের দ্বারা মূর্তিপূজার সূচনা বা গোড়াপত্তন হওয়া এবং তাদের দেখাদেখি হিন্দুসমাজে মূর্তিপূজা চালু হওয়া সম্পর্কে মহর্ষি দয়ানন্দের অভিমত সত্য হতে পারে না।

মহর্ষি দয়ানন্দের এ ভুল হওয়ার কারণ আমরা জানি না এবং তা নিয়ে চুলচেরা বিচারে প্রবৃত্ত হওয়ার ইচ্ছা, প্রয়োজন এবং সুযোগও আমাদের নেই।

আমরা শুধু এটুকু বলেই ক্ষান্ত হচ্ছি যে, যেহেতু এখন থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে গৌতম বুদ্ধ মূর্তিপূজার সাথে পরিচিত হয়েছিলেন অতএব একরূপ নিশ্চিতরূপেই ধরে নিতে হয় যে, এখন থেকে অন্তত তিন হাজার বছর পূর্বে হিন্দুসমাজে মূর্তিপূজার সূচনা হয়েছিল।

এখানে একটি কথা পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন যে, হিন্দুসমাজ কর্তৃক দুর্গা, লক্ষ্মী, কালী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ, শনি, সুবচনী, মনসা, মঙ্গলচণ্ডী প্রভৃতি

www.pathagar.com

বহুসংখ্যক দেবদেবীর মূর্তিপূজিত হয়ে চলেছে। সবগুলো দেবদেবীর মূর্তিকে যে একদিনে এবং একই সঙ্গে উপাস্যের আসনে বসানো হয়নি সেকথা সহজেই অনুমেয়। মূর্তিপূজার প্রাচীনত্ব বা সূচনার কথা জানতে হলে কোনও দেব বা দেবীর মূর্তিকে প্রধান ও প্রথম উপাস্য হিসেবে নির্বাচন করে এ কাজের সূচনা করা হয়েছিল সেকথা অবশ্যই আমাদের নির্ণয় করতে হবে।

এখানে সেসম্পর্কে কিছু বলতে চাইনা। পরবর্তী "পরিবেশের প্রভাব" শীর্ষক নিবন্ধে সেসম্পর্কে আলোকপাত করা হবে।

অতঃপর অন্যান্য কতিপয় দেশের মূর্তিপূজা কত প্রাচীন সেসম্পর্কে পৃথক পৃথকভাবে সংক্ষেপে আলোকপাত করা যাচ্ছে।

০ ইরাকের রাজা নমরুদ (বিলু নিপরু বা আল নিমরোদ— পরাক্রান্ত শিকারী দেবতা)-এর রাজকীয় মন্দিরে প্রধানদেবতা শমাশ বা শিম্‌শ (সূর্যদেব) ছাড়াও সিন (চন্দ্রদেবতা) ইসতার (প্রেম এবং সৌন্দর্যের দেবতা) অনলীল (মাটির দেবতা) প্রভৃতি দেবদেবীদের মূর্তিপূজা প্রচলিত থাকা এবং তার বিরোধিতা করার অপরাধে হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে অন্যান্য শাস্তি ছাড়াও অগ্নিতে নিক্ষেপ করার ঘটনা প্রায় সকলেই জানা রয়েছে।

ঐতিহাসিকদের মতে যিশুখ্রিস্টের জন্মের প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। অতএব এটা ছিল এখন থেকে প্রায় ৪৫০০ বছর পূর্বের ঘটনা।

এমতাবস্থায় এ-মূর্তিসমূহের নির্মাণ এবং পূজানুষ্ঠান যে এখন থেকে অন্তত ৪৫০০ বছর পূর্বে শুরু হয়েছিল সেকথা অনায়াসে বলা যেতে পারে।

০ পবিত্র কাবাগৃহের অভ্যন্তরে হোবল, লাত, মানাত, উজ্জা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে ৩৬০টি মূর্তি প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং সম্পূজিত হওয়ার ঘটনাও ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। কিন্তু প্রসিদ্ধ হলেও ইরাকের মূর্তিসমূহের মতো এগুলো তত প্রাচীন ছিল না। কেননা ইরাকের অগ্নি পরীক্ষারও বহু পরে ৮৬ বছর বয়সে হযরত ইব্রাহীম (আ.) শিশুপুত্র ইসমাঈল এবং হাজেরা (আ.)-কে যে কাবা সন্নিহিত স্থানে রেখে গিয়েছিলেন এবং কয়েক বছর পরে এ ইসমাঈল (আ.)-সহ কাবাগৃহের পূর্ণনির্মাণ করেছিলেন এটাও অন্তত মুসলমানমাত্রেরই জানা রয়েছে। এ সময়ে যে কাবাগৃহে কোনও মূর্তি ছিল না এবং হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর জীবদ্দশায় যে সেখানে কোনও মূর্তির অনুপ্রবেশ ঘটতে পারেনি— ঘটতে পারা যে সম্ভবই ছিল না সেকথা খুলে বলার অপেক্ষা রাখে না।

পরবর্তী সময়ে একত্ববাদী চিন্তাধারার ক্ষেত্রে বিরাট শূন্যতা সৃষ্টি হওয়ার কারণেই যে তদানিন্তন সেবায়েতদের দ্বারা এসব মূর্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল সেকথাও খুলে বলার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করি না। অতএব কাবাগৃহে

www.pathagar.com

মূর্তি প্রতিষ্ঠা এবং পূজানুষ্ঠানের কাজ এখন থেকে প্রায় চার হাজার বছর পূর্বে শুরু হয়েছিল বলে আমরা ধরে নিতে পারি।

০ মিশর থেকে পালিয়ে এসে দীর্ঘদিন যাযাবর অবস্থায় থাকাকালে বনি ইসরাইল সম্প্রদায় কর্তৃক স্বর্ণ দ্বারা গোবৎসের মূর্তি নির্মাণ এবং সেই মূর্তির পূজা সম্পর্কীয় ঘটনাটি পবিত্র কুরআনে বিবৃত হয়েছে। বনি ইসরাইলদের এ যাযাবর অবস্থা যিশুখ্রিস্টের জন্মের প্রায় তের শত বছর পূর্বে ঘটেছিল বলে সুস্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। অতএব এ গোবৎস-মূর্তির পূজা যে এখন থেকে প্রায় তিন হাজার তিনশত বছর পূর্বের ঘটনা সেকথা একরূপ নিঃসন্দেহেই ধরে নেয়া যেতে পারে।

০ গ্রীক পুরাণে বহুসংখ্যক দেবদেবীর নাম এবং তাদের অদ্ভুত অলৌকিক কার্যকলাপের বহু চমকপ্রদ বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। এই পুস্তকের "অন্যান্য দেশের দেবদেবীদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়" শীর্ষক নিবন্ধে যেসব দেবদেবীর নাম তুলে ধরা হয়েছে তার অধিকাংশই গ্রীক দেবদেবী। হিসেব করে দেখা গিয়েছে— গ্রীক পুরাণাদির রচনা এবং মূর্তিপূজার শুরু এখন থেকে প্রায় তিন হাজার বছর পূর্বের ঘটনা।

০ সপ্তাশ্চর্যের অন্যতম আশ্চর্য রোডস্ দ্বীপের সুবিশাল পিতল মূর্তিটি আসলে অ্যাপোলো দেবের মূর্তি। গ্রীক এবং রোমানদের মতে অ্যাপোলো হলেন— সূর্যদেব। রোডস্ দ্বীপে এ মূর্তির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল এখন থেকে প্রায় ৩,২৬৩ বছর পূর্বে।

০ গ্রীসের হারমিয়ন, ট্রোরেজেন, উলফিস, অর্টেমিস, সাই কিয়ন প্রভৃতি অঞ্চলে এ অ্যাপোলো দেবের পূজার জন্য বহুসংখ্যক "সূর্য মন্দির" (Tample of the sun) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। অতএব গ্রীক এবং রোমানরা যে সূর্যপূজক ছিলেন এবং এখন থেকে প্রায় ৩৫০০ বছর পূর্বে ওসব স্থানে অ্যাপোলো বা সূর্যমূর্তির পূজা শুরু হয়েছিল সেকথা অনায়াসে ধরে নেয়া যেতে পারে।

০ সুলেখক এবং তথ্যানুসন্ধানী আব্দুস সাত্তার তাঁর লিখিত "আরণ্য সংস্কৃতি" নামক গ্রন্থে বহু উপজাতীয় সম্প্রদায় এবং বেশ কয়েকটি প্রাচীন সভ্য জাতির মধ্যে মূর্তিপূজার উদ্ভব ঘটা সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন এবং তাঁর কথার সমর্থনে অকাট্য যুক্তি ও নির্ভরযোগ্য বহু তথ্য প্রমাণও তুলে ধরেছেন। আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি 'মেশা ভারদে ন্যাশনাল পার্ক' (Messa Verde National Park)-এ বিখ্যাত 'সূর্য পিরামিড' (Pyramid of the sun), 'নাটসেস' (Natchez), 'ইনকাস' (Incas), 'চেয়েন্নি' (Chryanne) প্রভৃতির কথা উল্লেখ করে ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা,

www.pathagar.com

মেলানেগিয়া, পলিয়নেসিয়া, মাইক্রোনেসিয়া, পারস্য, গ্রিস প্রভৃতি দেশে প্রধানদেবতা হিসেবে সূর্যের পূজা প্রচলিত থাকার কথা অকাট্যরূপে প্রমাণ করেছেন।

ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এ পূজার সূচনা হলেও এ সূচনার কাজ যে এখন থেকে চার হাজার বছরের মধ্যে এমনকি এদের কোনও কোনওটি যে এখন থেকে এক হাজার বছরের মধ্যে ঘটেছে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে।

'আল বেরুনীর ভারত-তত্ত্ব' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে 'মূর্তিপূজার সূচনা ও বিগ্রহসমূহের বিবরণ' শীর্ষক নিবন্ধে বেশ কয়েকটি দেশের মূর্তিপূজার সূচনা এবং যে ঘটনার ওপর ভিত্তি করে এ সূচনা হওয়ার দাবি করা হয় তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ইতোপূর্বে অন্যত্র তুলে ধরা হয়েছে।

Torah গ্রন্থের অনুগামীরা[১] যে হযরত ইব্রাহিম (আ.)-এর প্রপিতামহ সারুঘের সময় থেকে মূর্তিপূজার সূচনা হওয়ার কথা বিশ্বাস করেন উক্ত গ্রন্থে বিশেষ দৃঢ়তার সাথে সেকথা লিখা হয়েছে।

উক্ত গ্রন্থের বিবরণ নির্ভুল হলে ধরে নিতে হয় যে, এখন থেকে প্রায় ৪,৩০০ বছর পূর্বে সেখানে মূর্তিপূজার সূচনা হয়েছিল।

০ যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে রোমানদের মধ্যে মূর্তিপূজার সূচনা হয়েছিল বলে দাবি করা হয়ে থাকে সে-ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে 'আল বেরুনীর ভারত-তত্ত্ব' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে লিখা হয়েছে :

Romulus ও Romanus নামক ফ্রাঙ্ক ভ্রাতৃদ্বয় রাজা হয়ে রোম-নগরীর পত্তন করে পরে Romulus তার ভ্রাতাকে হত্যা করে। ফলে দীর্ঘকাল যাবত অন্তর্বিপ্লব এবং যুদ্ধবিগ্রহ চলতে থাকে। অবশেষে Romulus স্বপ্নে দেখে যে তাঁর ভ্রাতাকে সিংহাসনে না বসানো পর্যন্ত শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে না। সে তখন তার ভ্রাতার একটি স্বর্ণমূর্তি নির্মাণ করে সিংহাসনে নিজের পার্শ্বে স্থাপন করে এবং প্রতিটি রাষ্ট্রীয় ঘোষণায় "আমরা (উভয়ে) এ আদেশ দিচ্ছি" এ বাক্য ব্যবহার করতে থাকে। সেই থেকে বহু বচন ব্যবহার করা রাজাদের অভ্যাস হয়ে গেছে।

এর পরে Romulus এক উৎসবের আয়োজন করে এবং অভিনয়াদি দ্বারা তার ভ্রাতার সমর্থকদের শত্রুতা প্রশমিত করতে চেষ্টা করে। তাছাড়া চার রং-এর চারটি অশ্বারোহীর মূর্তি নির্মাণ করে সে সূর্যের একটি কীর্তিসৌধও নির্মাণ করে। সবুজ বর্ণের মূর্তিটি মৃত্তিকার প্রতীক, নীল বর্ণের মূর্তিটি জলের, লালটি

১. ইহুদী বা বনি ইসরাঈল সম্প্রদায়।

www.pathagar.com

অগ্নির এবং শ্বেত মূর্তিটি বায়ুর প্রতীক। অতঃপর এ মূর্তি চতুষ্টয়ের পূজা করা হয়। এ সৌধটি এখনও রোমে বিদ্যমান রয়েছে।

ঐতিহাসিকদের মতে যিশুখ্রিস্টের জন্মের ৭৩৫ বছর পূর্বে রোম নগরীর পত্তন হয়। এ হিসেবে এখন থেকে ২,৭১৭ বছর পূর্বে রোম নগরীতে মূর্তিপূজার সূচনা হয়েছিল বলে ধরে নিতে হয়।

০ প্রাচীন পারস্যবাসীরা যে প্রতিগৃহে অগ্নিশিখাকে অনির্বাণ রাখা এবং অগ্নিপূজায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল ইতিহাসের পাঠক মাত্রেরই সেকথা জানা রয়েছে। পরে তারা 'হবারে' বা সূর্যকে 'আহুরা মাজদা' বা জ্ঞানময় পরমব্রহ্মের চক্ষু কল্পনা করে সূর্যপূজাও শুরু করেছিল সেকথাও তাদের অজানা নয়।

বৈদিক যুগে আর্যাবর্তে যজ্ঞ ও হোম বিশেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠানরূপে চালু থাকার কথা ইতোপূর্বে আমরা জানতে পেরেছি। যজ্ঞ এবং হোমকে অগ্নিপূজা ছাড়া আর কিছু বলা যেতে পারে না।

পারশ্যে প্রবেশকারী আর্য শাখাটির দ্বারাই যে যজ্ঞ ও হোমের অনুকরণে সেখানে অগ্নিপূজার সূচনা হয়েছিল সেকথা সহজেই অনুমেয়। আর্যাবর্তে এখন থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বে যজ্ঞ ও হোম প্রচলিত থাকার প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। অতএব পারশ্যে অগ্নিপূজার সূচনা যে পাঁচ হাজার বছরের অধিক নয় সেকথা বলাই বাহুল্য।

মূর্তিপূজার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে আর একটি মাত্র ঘটনার বিবরণ দিয়ে এ নিবন্ধের ইতি টানছি। এটাই যে পৃথিবীর প্রাচীনতম মূর্তিপূজা এবং এ থেকেই যে পৃথিবীতে মূর্তিপূজার সূচনা হয়েছিল বিবরণটি থেকে তার অকাট্য ও বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যাবে বলে দৃঢ় আশা পোষণ করি।

০ প্রসিদ্ধ চিন্তাবিদ, প্রখ্যাত আলেম এবং এতদ্দেশে আহলে হাদিস আন্দোলনের অন্যতম নেতা আব্দুল্লাহ হিল কাফী আল কোরায়শী তর্জুমানল হাদীস, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যায় সূরা ফাতিহার তফসির লিখতে গিয়ে মূর্তিপূজার সূচনা সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন।

সূরা নূহ-এর ২৩ নং আয়াতটি থেকে তিনি অকাট্যরূপে প্রমাণ করেছেন যে, হযরত নূহ (আ.)-এর সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত এবং বিশেষভাবে জনপ্রিয় পাঁচজন সাধু পুরুষের মূর্তিপূজা থেকেই পৃথিবীতে মূর্তিপূজার সূচনা হয়েছিল।

পবিত্র কুরআনের উক্ত আয়াত অনুযায়ী সেই পাঁচ ব্যক্তির নাম যথাক্রমে ওয়াদ, ছুওয়া, ইয়াগুচ্ছ, ইয়াউক ও নছর। বিভিন্ন তফসির এবং হাদীস শরীফের বরাত দিয়ে তিনি প্রমাণ করেছেন যে, এ পাঁচ ব্যক্তি হযরত আদম (আ.) ও হযরত নূহ (আ.)-এর অন্তর্বর্তী যুগের সাধু পুরুষ ছিলেন।

www.pathagar.com

জীবদ্দশায় লোকেরা এদের অনুসরণ এবং এদের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি পোষণ করতো। এদের মৃত্যুর পরে এ শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শনের জন্য এদের সমাধিতে গিয়ে ধর্ণা দেয় এবং ঘটা করে শোক প্রকাশ করার নিয়ম চালু করা হয়।

সকলের পক্ষে সমাধিতে গমন সম্ভব নয় বিধায় পরবর্তী সময়ে এদের ছবি অংকন করে সভা-সমিতি এবং প্রকাশ্য স্থানসমূহে টাঙ্গানো হতে থাকে।

পরবর্তী বংশধরেরা অজ্ঞতা এবং ভক্তির আতিশয্যে তাদের মূর্তি নির্মাণ ও ঘরে ঘরে সেই মূর্তির প্রতিষ্ঠা দান করে। এভাবে কিছুদিন চলার পরে পরবর্তী বংশধররা শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও বিভিন্ন কামনা-বাসনা পূরণের অভিপ্রায়ে উক্ত মূর্তিসমূহের পূজা শুরু করে দেয়।

প্রখ্যাত তফসির ইবনে কাসির (৯) ৭ ও ৮ পৃষ্ঠা এবং আরযুল কুরআন (২) ২৩৫ পৃষ্ঠার বরাত দিয়ে তর্জুমানুল হাদীসের উক্ত সংখ্যায় বলা হয়েছে : অনাবৃষ্টির সময়ে মানুষেরা বৃষ্টি লাভের আশায় এ পাঁচ জনের প্রথম অর্থাৎ ওয়াদের মূর্তিকে ভোগ-নৈবেদ্যাদি দিয়ে পূজা করতো এবং বৃষ্টি প্রার্থনা করতো।

বাকি মূর্তি চতুষ্টয়ের কোনওটির পূজা কি উদ্দেশ্যে করা হতো তার বিবরণ দিতে গিয়ে উক্ত সংখ্যায় যে কথাগুলো বলা হয়েছে সে-গুলোকে নিম্নে হুবহু উদ্ধৃত করে এ প্রসঙ্গের ইতি টানছি।

"মোটকথা পৃথিবীতে সর্বপ্রথম মানুষেরা যাহাদের পূজা আরম্ভ করিয়াছিল, তাহারা তাহাদের মতই মানুষ ছিল এবং তাহাদিগকে তাহারা আল্লাহ্‌রূপে পূজা করিত না। আল্লাহর রববিয়তে অল্পবিস্তর তাহাদেরও ভাগ আছে এই ধারণার বশবর্তী হইয়াই তাহারা তাহাদের পূজায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল।"

পরবর্তী যুগে "ওয়াদ" প্রেমের দেবতারূপে পূজিত হইত। তাহার প্রতিপক্ষ শত্রুতার দেবী ছিল "নকরাহ"। কেহ কেহ মনে করেন ওয়াদ 'উ' হইতে ব্যুৎপন্ন। ব্যাবিলীয়দের ভাষায় উহা সূর্যের নাম।"

'ইয়াউক'-এর অর্থ— বিপত্তারণ। 'ইয়াগুচ্ছ'-এর আভিধানিক অর্থ— শকুন। শকুনের আকারে আকাশে যে তারকাপুঞ্জ আছে আরবী ভাষায় তাকে 'নছর' বলা হয়। ব্যাবিলীয়দের অন্যতম দেবতার নাম— 'নছরক' ছিল।

ওয়াদ-এর মূর্তিই যে পৃথিবীর প্রাচীনতম ও প্রথম পূজিত মূর্তি অর্থাৎ এ থেকেই যে পৃথিবীতে মূর্তিপূজার সূচনা হয়েছিল ওপরোক্ত তফসিরদ্বয়ের বিবরণ থেকে সেকথা সুস্পষ্ট ও নিঃসন্দিগ্ধরূপে আমরা জানতে পারলাম। এবার আসুন এখন থেকে কতদিন পূর্বে পৃথিবীর সর্ব প্রথম মূর্তিপূজার সূচনা হয়েছিল সেকথা জানার চেষ্টা করি।

বিশেষজ্ঞদের মতে— এখন থেকে প্রায় পনের হাজার বছর পূর্বে হযরত নূহ্ (আ.)-এর সময় মহাপ্লাবন সংঘটিত হয়েছিল। এ প্লাবনের কারণেই যে ভূমধ্য

www.pathagar.com

উপত্যকা মধ্যসাগরে পরিণত হয় এ বিশ্বাসও অত্যন্ত দৃঢ়রূপে তাঁরা পোষণ করেন বলে জানা যায়।

উক্ত তফসিরদ্বয়ের বর্ণনানুযায়ী ওয়াদ এবং বাকি চারজন সাধু পুরুষ হযরত আদম (আ.) এবং হযরত নূহ (আ.)-এর অন্তর্বর্তী সময়ে বিদ্যমান ছিলেন।

বাইবেলের বিবরণনুযায়ী হযরত আদম (আ.) থেকে হযরত নূহ (আ.) পর্যন্ত সময়ের ব্যবধান ৭,০৩০ বছর। বিশেষজ্ঞদের মতে হযরত নূহ (আ.)-এর সময়ে সংঘটিত মহাপ্লাবন যে এখন থেকে প্রায় পনের হাজার বছর পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল ইতোপূর্বে সেকথা বলা হয়েছে। ওয়াদ যদি হযরত (আ.) এবং হযরত নূহ (আ.)-এর অন্তর্বর্তী সময়ে মানুষ হন তবে ধরে নেয়া যেতে পারে যে এখন থেকে (১৫,০০০ + ৩,৫০০) সাড়ে আঠারো হাজার বছর পূর্বে তিনি জীবিত ছিলেন।

অতএব মোটামুটিভাবে ধরে নেয়া যেতে পারে যে এখন থেকে অন্তত সাড়ে আঠারো হাজার বছর পূর্বে ওয়াদের মূর্তি নির্মাণ ও পূজানুষ্ঠানের মাধ্যমে এ পৃথিবীতে সর্ব প্রথম মূর্তিপূজার সূচনা হয়েছিল।

শিয়ালকোটের প্রখ্যাত মাওলানা মুহাম্মদ সাদেক উর্দু ভাষায় তাঁর লিখিত "আনোয়ারুত্ তাওহিদ" নামক গ্রন্থে এ পৃথিবীতে মূর্তিপূজার সূচনা সম্পর্কীয় যে বিবরণ তুলে ধরেছেন ওপরোক্ত বিবরণের সাথে তা হুবহু মিলে যায়।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, বিশাল বিশ্বের সকল দেশের এ সম্পর্কীয় তত্ত্ব ও তথ্যাদি সংগ্রহ করা এবং ক্ষুদ্র পুস্তকে তুলে ধরা কোনওক্রমেই সম্ভব নয়। তবে মূর্তিপূজার গোড়ার কথা বা পৃথিবীতে কখন এবং কিভাবে মূর্তিপূজার সূচনা হয়েছিল সেটা নির্ণয় করাই ছিল বক্ষমান নিবন্ধের উদ্দেশ্য। এ কতিপয় দেশের বিবরণ থেকেই আমাদের সেই উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে বিধায় এখানেই নিবন্ধের ইতি টানা হলো।

পরিবেশের প্রভাব

মানুষকে 'পরিবেশের সন্তান' বলা হয়ে থাকে। কথাটিকে একটু পরিষ্কার করে বলতে হয় যে, দেশের ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ু বা প্রাকৃতিক অবস্থান, খাদ্যাখাদ্য, অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট, রাজনৈতিক কার্যকলাপ প্রভৃতি অন্য কথায় স্থানীয় পরিবেশ ও উদ্ভুত পরিস্থিতির প্রভাবকে অমান্য অগ্রাহ্য করা কোনও মানুষের পক্ষেই সম্ভব হয়ে ওঠে না।

www.pathagar.com

ফলে এসবের ওপর ভিত্তি করেই ভিন্ন ভিন্ন দেশের মন-মানস, স্বভাব-চরিত্র, অভ্যাস-আচরণ, আবেগ-অনুরাগ, সভ্যতা, সংস্কৃতি প্রভৃতি কম-বেশ ভিন্ন ভিন্ন হয়ে গড়ে উঠতে দেখা যায়। ভিন্ন দেশের মানুষের প্রয়োজনের মধ্যেও ভিন্নতা রয়েছে। অর্থাৎ এক দেশের মানুষের জন্য অপরিহার্য নয় এমন এক বা একাধিক দ্রব্য অন্য দেশের মানুষের জন্য অপরিহার্য হতে পারে।

হিন্দুসমাজে মূর্তিপূজার সূচনা সম্পর্কে লিঙ্গ এবং বিষ্ণুপুরাণের একটি উপাখ্যান হলো : সৌনক রাজা অর্জুনের পৌত্র পরীক্ষিতের কাছে প্রখ্যাত রাজা অম্বরীষের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেছেন— বিরাট এক রাজ্যের রাজা হয়েও অম্বরীষ সর্বদা ঈশ্বরের চিন্তায় মগ্ন থাকতেন। এতে সন্তুষ্ট হয়ে ঈশ্বর একদা ইন্দ্রের রূপ ধারণ ও হাতির পিঠে চড়ে অম্বরীষের কাছে আসেন এবং বর প্রার্থনা করতে বলেন।

অম্বরীষ ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কারো কাছে বর প্রার্থনা করতে অস্বীকৃতি জানালেন ইন্দ্ররূপী ঈশ্বর তাকে হত্যা করার ভয় দেখান। অম্বরীষ অটল থাকেন। তখন ঈশ্বর নীলপদ্মের বর্ণ, শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মধারী গৈরিক বসন পরিহিত মানবরূপে এবং গরুড় নামক পাখির পৃষ্ঠে সমাসীন হয়ে অম্বরীষকে দর্শন দান করেন। এবং ঈশ্বরকে সর্বদা স্মরণ রাখার সাথে সাথে রাজ্যে শান্তি, ন্যায় ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠার কাজে আত্মনিয়োগ করার জন্য উপদেশ প্রদান করেন।

রাজকার্যের ভীষণ ঝামেলার মধ্যে থেকেও সর্বদা ঈশ্বরকে স্মরণে রাখা যায় এবং সাধারণ মানুষেরাও যাতে অতি সহজে ঈশ্বরকে স্মরণে রাখতে পারে তা একটা উপায় করে দেয়ার জন্যে অম্বরীষ মানবরূপী ঈশ্বরকে অনুরোধ জানান।

উত্তরে ঈশ্বর বলেন— "আমার এই চতুর্ভুজ, শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মধারী মানবরূপের মূর্তি নির্মাণ করে সেই মূর্তির ধ্যান ও পূজা করবে।"

এ বর্ণনানুযায়ী তখন থেকেই মূর্তিপূজার সূচনা হয়েছে বলে দাবি করা হয়ে থাকে। অতএব এ দাবি অনুযায়ী ধরে নিতে হয় যে, ভারতীয় হিন্দুসমাজ কর্তৃক সর্বপ্রথম এ মানবাকৃতি এবং চতুর্ভুজ দেবমূর্তিটিই উপাস্য হিসেবে পূজিত হয়েছিল। কিন্তু তা ধরে নেয়ার উপায় নেই। কারণ কূর্মপুরাণ এ সম্পর্কে ভিন্ন বিবরণ পরিবেশন করেছে। উক্ত বিবরণটি হলো :

এক ব্রাহ্মণের নারদ নামে এক সন্তান ছিল। ঈশ্বর দর্শনই ছিল তার একমাত্র কামনা। সৌভাগ্যবশত একদিন পথ চলতে চলতে অদূরে এক অপূর্ব জ্যোতি তার দৃষ্টিগোচর হয়। সে জ্যোতির নিকটবর্তী হওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু আকাশবাণী শুনে তাকে থমকে দাঁড়াতে হয়। আকাশবাণীটি এই ছিল যে, "তোমার অভিষ্ট পূরণ হবে না সুতরাং আর অগ্রসর হয়ো না।" মানবাকৃতি এক

www.pathagar.com

০ রামায়ণের বিবরণে প্রকাশ : রাবণবধের পরে রামচন্দ্র সর্বপ্রথম যে কাজটি করেছিলেন তা হলো শিবলিঙ্গের পূজা। এজন্যে তিনি স্বহস্তে বালুকা দ্বারা একটি লিঙ্গমূর্তি নির্মাণ করেছিলেন বলেও বিবরণে উল্লেখ থাকতে দেখা যায়।

০ ইতিহাস প্রসিদ্ধ সোমনাথের মন্দিরে যে মূর্তিটি প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং যার কিছু অংশ আজও গজনির এক মঠে পড়ে রয়েছে তাও বিশাল আকারের এক লিঙ্গমূর্তি।

০ সিন্ধু প্রদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে হিন্দুদের যত মন্দির রয়েছে তার প্রায় প্রত্যেকটিতেই শিবলিঙ্গের মূর্তি বিদ্যমান রয়েছে। তাছাড়া গোটা ভারতবর্ষব্যাপী মাটি, পাথর ও বিভিন্ন ধাতব পদার্থ নির্মিত ছোট, বড়, মাঝারি আকারের যেসব লিঙ্গমূর্তি রয়েছে তার সংখ্যা সকল দেব-দেবী মূর্তির মিলিত সংখ্যার চেয়ে বেশি।

০ অগ্নিপুরাণ তৃতীয় অধ্যায় ১৮শ থেকে ২২তম শ্লোকসমূহে লিঙ্গমূর্তির উদ্ভব সম্পর্কে যে বিবরণ রয়েছে তার হুবহু বঙ্গানুবাদ উক্ত পুরাণ থেকে উদ্ধৃত করা যাচ্ছে :

"অনন্তর ভগবান হরহরিকে বলিলেন, আমাকে তোমার মোহিনী মহিলারূপ দেখাও। তৎশ্রবণে হরি অমনি মোহিনীরূপ ধারণ করিলেন। মায়ামুগ্ধ মহাদেব তখন গৌরকে ছাড়িয়া সেই মোহিনীর সহবাসে অভিলাষী হইলেন এবং নগ্ন ও উন্মত্ত হইয়া তাহার কেশপাশ ধারণ করিলেন। রমণী তখন কেশপাশ ছাড়াইয়া পলায়নে প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে রুদ্র ও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া চলিলেন। তখন স্থানে স্থানে মহাদেবের বীর্য পতিত হইয়াছিল তাহাতে সেই সেই স্থানে এক একটি কনকময় শিবলিঙ্গ সমুদ্ভূত হয়।"

০ যাজক শ্রেণী বিশেষ করে শৈব ও শাক্ত সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণদের যাজনিক কাজ— অর্থাৎ দেবদেবীর মূর্তিপূজা প্রভৃত করার অধিকার লাভের জন্য উপনয়নের পরে নতুন করে আবাব দীক্ষাগ্রহণ করতে হয়।

এ দীক্ষাগ্রহণের পরে প্রত্যহ শিবলিঙ্গের পূজা তাদের জন্য বাধ্যতামূলক হয়ে থাকে। বলা আবশ্যক যে, অন্য কোনও দেব বা দেবীমূর্তির পূজা ব্যক্তিগতভাবে কারো জন্যে বাধ্যতামূলক নয়।

মাটি দিয়ে নির্মিত টাটকা লিঙ্গমূর্তির পূজাই বিশেষভাবে ফলপ্রদ বিধায় প্রত্যহ মাটি দিয়ে এ লিঙ্গ নির্মাণ করা হয় এবং পূজার পরে ফেলে দেয়া হয়। হিসেব করলে দেখা যাবে যে, হিন্দুসমাজের বিভিন্ন মন্দির মঠ ও স্থানসমূহে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গমূর্তিসমূহ ছাড়াও প্রত্যহ এমনিভাবে হাজার হাজার লিঙ্গমূর্তি নির্মিত ও সম্পূজিত হয়ে চলছে।

www.pathagar.com

জ্যোতির্ময় পুরুষকে সেখানে দেখতে পাওয়া যায়। অকস্মাৎ তিনি বলেন— "আমার এ রূপ ছাড়া আর অন্য কোনওরূপে তুমি আমার দর্শন পাবে না।" সেই থেকে এ মানবাকৃতি জ্যোতির্ময় পুরুষের মূর্তি নির্মিত ও সম্পূজিত হয়ে আসছে।

উল্লেখ্য, "আল বেরুনীর ভারত-তত্ত্ব" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থেও এ বিবরণ দুটি তুলে ধরা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো : একবার ইন্দ্রের ছদ্মবেশে, একবার চতুর্ভুজ মানবরূপে, আর একবার জ্যোর্তিময় পুরুষরূপে দর্শন দেওয়া ছাড়াও পুরাণের বর্ণনানুযায়ী তিনি বিভিন্ন সময়ে নারী, বালক, মৎস, কচ্ছপ, শুকর প্রভৃতিরূপেও আবির্ভূত হয়েছেন বলে জানা যায়। তার এ ভিন্ন ভিন্ন রূপগ্রহণ বা ছদ্মবেশ ধারণের কারণ কি?

সেই অসীম অনন্তকে যদি কোনও কারণে রূপপরিগ্রহ করতেই হয় তবে যেকোনও একটি রূপই যথেষ্ট হতো, আর মানবসমাজও অনর্থক বিভ্রান্তির শিকার না হয়ে অতি সহজেই তাঁকে চিনতে পারতো।

এখানে আর একটা অসুবিধা হলো : মানুষের স্বভাব। কেউ যদি অপরের ছদ্মবেশ ধারণ বা যখন তখন রূপ পরিবর্তন করে তবে মানুষ তাকে 'বহুরূপী' 'সঙ', 'ভাঁড়' প্রভৃতি বলে আখ্যায়িত করে; উপেক্ষা এবং ঠাট্টা-বিদ্রূপও করতে দেখা যায়। অসীম অনন্ত এবং সর্বজ্ঞ বিশ্বপ্রভু অতি অবশ্যই মানুষের এ স্বভাবের কথা জানেন, সবকিছু জেনেও তিনি বহুরূপী, সঙ বা ভাঁড়ের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন স্বাভাবিক বিবেক-বুদ্ধি এটাকে কোনওক্রমেই সত্য ও স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে চায় না।

এমতাবস্থায় লিঙ্গ, বিষ্ণু এবং কূর্মপুরাণে স্বয়ং ভগবান কর্তৃক রূপ পরিবর্তন বা ছদ্মবেশ ধারণের এসব বিবরণ কিভাবে সত্য ও শাশ্বত বলে স্থান পেলো সেটা বুঝতে পারা শুধু যে কঠিনই নয়— রীতিমত বিস্ময়করও সেকথা খুলে বলার অপেক্ষা রাখে না।

ভগবান ব্রহ্মার প্ররোচনায় মিথ্যা সাক্ষ্যদানের অভিশাপে "গরুর সম্মুখ ভাগের পরিবর্তে পশ্চাৎভাগের পূজা করার নির্দেশ এবং অতঃপর কোনও পূজায় কেতকীফুলের ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা" প্রভৃতি বিবরণ থেকে তৎকালে শিবলিঙ্গ পূজা এবং উক্ত পূজায় গো-দুগ্ধ ও কেতকীফুল ব্যবহৃত হওয়ার ইঙ্গিতটিও পাঠকবর্গের নযরে পড়েছে বলে আশা রাখি।

তবে কেউ কেউ উক্ত বিবরণটিতে গো-পূজার ইঙ্গিতও যে রয়েছে সেকথা বলতে পারেন। কিন্তু একটু অভিনিবেশ সহকারে বিবরণটি পাঠ করলে তাঁরা অবশ্যই বুঝতে পারবেন যে, গো-পূজার ইঙ্গিত থাকলেও শিবলিঙ্গের পূজাকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে এবং শিবলিঙ্গকেই প্রধান ও প্রথম উপাস্য হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে।

www.pathagar.com

শিবলিঙ্গ যে প্রধান উপাস্য এবং প্রধান উপাস্য হিসেবে এর পূজা যে প্রথমে শুরু হয়েছিল এবং তা-ই যে স্বাভাবিক ওপরের এ কতিপয় তথ্যপ্রমাণ থেকেই তা বুঝতে পারা যাবে বলে বাহুল্যবোধে আর অধিক তথ্য প্রমাণ তুলে ধরা হলো না। তবে এখানে একটি কথা বলা না হলে আলোচনার অঙ্গহানি হবে বিধায় একান্ত বাধ্য হয়েই বলতে হচ্ছে যে, প্রতিটি লিঙ্গমূর্তির সাথে যোনিপীঠও সংযুক্ত থাকে। শাস্ত্রপাঠ করেছেন অথবা মন্দিরাদিতে প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গমূর্তি দেখেছেন এমন ব্যক্তি মাত্রেরই এটা জানা রয়েছে। যারা এ সম্পর্কে অবহিত নন তাদের অবগতির জন্য বলা যাচ্ছে যে, প্রতিটি লিঙ্গমূর্তির অগ্রভাগ অর্থাৎ লিঙ্গের নিম্নাংশ যার মাঝে প্রোথিত থাকে ওটাই 'যোনি' (স্ত্রী-অঙ্গ)।

শিবলিঙ্গকেই যে প্রধান ও প্রথম উপাস্য হিসেবে পূজা করা হয়েছিল সে সম্পর্কে এখনও যদি কারো মনে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থেকে থাকে তাদের অবগতির জন্য লিঙ্গপূজার সময়ে যে ধ্যানমন্ত্রটি (ধ্যানের মাধ্যমে লিঙ্গের যে পরিচয় অন্তরে ফুটিয়ে তুলতে হয়) পাঠ করা হয় বঙ্গানুবাদ সহ তা হুবহু উদ্ধৃত করা যাচ্ছে :

ঐং প্রমত্তং শক্তি সংযুক্তং বাণাক্ষ্যঞ্চ মহাপ্রভং
কাম বাণান্বিত দেবং সংসার দহনক্ষমং
শৃঙ্গারাদি রোসাল্লাসং বাণাক্ষ্যং পরমেশ্বরম্।

অর্থাৎ— এ লিঙ্গ মাতাল সদৃশ, মহাশক্তিশালী, মহাপ্রভাযুক্ত ও বাণ নামে আখ্যাত। গোটা সংসার দহনে সক্ষম এটা এমনই কামবাণে পরিপূর্ণ। শৃঙ্গারাদি রসে উল্লসিত এ বাণ আখ্যাপ্রাপ্ত (লিঙ্গ)-ই পরমেশ্বর।

উল্লেখ্য যে শিবলিঙ্গকে 'বাণলিঙ্গ' বা 'বাণেশ্বর শিবলিঙ্গও' বলা হয়ে থাকে। বলাবাহুল্য, লিঙ্গের প্রতি এহেন গুরুত্ব আরোপ করা থেকেও লিঙ্গকেই যে প্রধান ও প্রথম উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে।

সাহিত্য, ইতিহাস ধর্মগ্রন্থ প্রচলিত কথা-কাহিনী, প্রভৃতির মাধ্যমেই কোন্ দেশে, কোন্ সময়ে কিরূপ পরিবেশ বিরাজমান ছিল এবং সেই পরিবেশের প্রভাবে তত্রৈত্য অধিবাসীদের গড়ে ওঠা মন-মানস, আচারানুষ্ঠান, রুচি-প্রকৃতি প্রভৃতিইবা কিরূপ ছিল তা জানা সম্ভব।

তাঁদের কারণে-অকারণে ক্রোধান্ধ হয়ে অপরকে অভিশাপ প্রদান, কথায় কথায় আত্মগরীমা প্রকাশ, সর্বদা হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ ও কলহে লিপ্ত হওয়া বিশেষ করে অতি জঘন্য ধরনের যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা প্রভৃতি বিবরণে ওসব ধর্মগ্রন্থ যে পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে সেগুলোর পাঠক মাত্রই তা লক্ষ্য করেছেন। এমনকি স্বয়ং ভগবানকেও যে এ থেকে রেহাই দেয়া হয়নি নিশ্চিতরূপেই অত্যন্ত বেদনার সাথে এটাও তাঁদের লক্ষিভূত হয়েছে।

www.pathagar.com

জননেন্দ্রিরই যে জীবসৃষ্টির মূল অর্থাৎ জননেন্দ্রিয়ের সক্রিয়তা ছাড়া কোনও জীব যে সৃষ্টি হতে পারে না এ-বাস্তব অভিজ্ঞতা তাদের প্রত্যক্ষ এবং দীর্ঘ দিনের। অতএব এ বিশ্ব-সৃষ্টির মূলেও জননেন্দ্রিয় সক্রিয় থাকার ধারণা তাদের মনে বদ্ধমূল হয়ে পড়েছিল। আর এ বিশাল বিশ্বের সৃষ্টি যে সর্বপ্রধান বা সকল দেবতার দেবতা মহাদেব বা শিবলিঙ্গের সক্রিয়তা ব্যতীত সম্ভব হতে পারেনি এ বিশ্বাসও তাঁরা করে নিয়েছিলেন। বলাবাহুল্য, লিঙ্গমূর্তিকে প্রধান ও প্রথম উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করার এটাই ছিল কারণ। এখানে উক্ত লিঙ্গের সাথে যোনিপীঠ সংযোজনের প্রশ্নে আসা যাক—

বিভিন্ন পুরাণের বর্ণনা থেকে জানা যায় : মহাদেব একদা স্বীয় পত্নী পার্বতীর সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হন। হঠাৎ তাঁর কামোদ্দীপনা এতই বৃদ্ধি পায় যে পার্বতীর প্রাণনাশের আশঙ্কা দেখা দেয়। তিনি মনে মনে শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করা মাত্রই শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ঘটে, তিনি সুদর্শনচক্রের দ্বারা শিবলিঙ্গটির গোড়ায় আঘাত করেন, ফলে ওটা দ্বি-খণ্ডিত হয়। লিঙ্গটি যোনিপীঠের মধ্যে যেভাবে অবস্থিত ছিল ঠিক সেভাবেই যোনিসহ লিঙ্গটির মূর্তি নির্মিত ও পূজিত হয়ে আসছে এবং এটাই শাস্ত্রীয় বিধি।

ভগবান মহাদেবের কামোত্তেজনা পার্বতীর প্রাণনাশের পর্যায়ে উপনীত হওয়া, সেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতি, তদানিন্তন অবস্থায় লিঙ্গের গোড়ায় সুদর্শনচক্রের অনুপ্রবেশ ও লিঙ্গকর্তন প্রভৃতি সম্ভব কিনা এসব প্রশ্ন মনে জাগা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু পুরাণ-প্রণেতা এবং ভক্ত অনুরক্তদের মতে এসব কিছুই ভগবানের লীলা; আর লীলার ক্ষেত্রে সবই সম্ভব। সুতরাং এ নিয়ে কোনওদিনই তাঁদের মনে কোনও প্রশ্ন জাগেনি : ভবিষ্যতে জাগবে কিনা একমাত্র ভবিতব্যই সেকথা বলতে পারে।

এ উভয় অঙ্গের সংযোজনও তদানিন্তন পরিবেশ এবং সেই পরিবেশে গড়ে ওঠা মানুষদের বাস্তব অভিজ্ঞতারই ফল। কেননা "জীব-সৃষ্টির জন্য পুংলিঙ্গের সক্রিয়তাই যথেষ্ট নয়— স্ত্রীলিঙ্গের সক্রিয়তারও প্রয়োজন রয়েছে।" অতএব এ বাস্তব অভিজ্ঞতাই তাদের উভয় অঙ্গের সংযোজন এবং সংযোজিত অঙ্গের মূর্তি নির্মাণে ও পূজানুষ্ঠানে অনুপ্রাণিত করেছিল বলে উক্ত মহল দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করেন।

শিবলিঙ্গের মূর্তিকে কেন তারা প্রধান ও প্রথম উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন সেকথা বোঝানোর জন্যই এখানে এমন বিস্তারিত আলোচনা করতে হলো। অতঃপর অন্যান্য কয়েকটি দেশের এ সম্পর্কীয় বিবরণকে অতি সংক্ষেপে পৃথক পৃথকভাবে তুলে ধরা যাচ্ছে।

www.pathagar.com

ইতালি : ইতালির অধিবাসী বিশেষ করে রোমানরা জুপিটারকে স্বর্গের রাজা, মানুষ ও দেবতাদের পিতা এবং প্রধানদেবতা কল্পনা করে তার মূর্তিপূজা করতো বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। জুপিটারকে তারা স্যাটার্ন (কৃষি ও সভ্যতার কর্তা)-এর পুত্র নেপচুন (সমুদ্র ও অন্যান্য জলাশয়ের কর্তা)-কে ভ্রাতা, জুনো (স্বর্গের রাণী, নারী জাতি ও বিবাহের কর্ত্রী)-কে তার স্ত্রী এবং ভগ্নি বলেও কল্পনা করতো। মোটকথা জুপিটারের মূর্তির পূজা থেকে সেখানে মূর্তিপূজার সূচনা হয়।

পারস্য : পারস্যবাসীরা আহুরা মাজদা বা জ্ঞানময় পরম ব্রহ্ম নামে একজন সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসের দাবি করলেও তেজময় অগ্নিকে তার প্রতীক কল্পনা করে অগ্নির উপাসনা শুরু করে এবং এমনভাবেই পারস্যে প্রতীক পূজার সূচনা ঘটে।

পরবর্তী সময়ে হবারে (Hvre) বা সূর্যদেবকে আহুরা মাজদার চক্ষু কল্পনা করে সূর্যপূজার সূচনা করা হয়। ফলে অগ্নি এবং সূর্য প্রধান উপাস্য হয়ে দাঁড়ায়।

এরও পরবর্তী সময়ে পারস্যবাসীদের মনে এ ধারণার সৃষ্টি হয় যে, মঙ্গল এবং অমঙ্গলের স্রষ্টা একজন হতে পারে না। বলাবাহুল্য, এমনিভাবে দুজন উপাস্যের সৃষ্টি হয়। মঙ্গলের স্রষ্টার নাম দেয়া হয় 'ইজদ' আর অমঙ্গলের স্রষ্টার নাম— আহরমন।

দেশের রাজার অধীনে এ দুই খোদার মূর্তি স্থাপিত হয় এবং কারো কল্যাণ বা অকল্যাণ ঘটলে রাজার বিচারানুযায়ী উভয়ের শাস্তি বা পূজা-পুরস্কার প্রদানের নিয়ম চালু করা হয়। এমনও প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে যে, কারো পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করলে রাজার বিচার অনুযায়ী ইজদ মূর্তির উদ্দেশ্যে মহা ধুমধামের সাথে লোভনীয় নৈবেদ্য উৎসর্গ করা হতো। আবার কারো পুত্রের মৃত্যুতে রাজার বিচারানুযায়ী আহর-মনের মূর্তির পৃষ্ঠে দশ, বিশ, পঁচিশ বা তার কমবেশি বেত্রাঘাত করা হতো।

এ নৈতিক তথ্য ধর্মীয় অধঃপতনের পরিণামে 'জন জমিন জর' বা নারী এবং ভূমিতে সবল পুরুষদেরই অধিকারের দাবি প্রবল হয়ে ওঠে, এর নারকীয় পরিণতির বিবরণে পারস্যের ইতিহাস চিরকলঙ্কিত হয়ে রয়েছে।

এ বিবরণ থেকে বুঝতে পারা সহজ যে, প্রথমে অগ্নি এবং সূর্যপূজার মাধ্যমে পারস্যে প্রতীকপূজার সূচনা হয় এবং পরে প্রতীক পূজাই মঙ্গল ও অমঙ্গলের স্রষ্টারূপে ইজদ ও আহরমনের মূর্তিকে পূজার আসনে প্রতিষ্ঠা দান করে।

চীন : আকাশে চন্দ্র, সূর্য, তারকাদির উদয়, আকাশ থেকে বৃষ্টিপাত, আকাশে মেঘের গর্জন ও বিদ্যুতের ঝলক প্রভৃতি দেখে চীনারা প্রাচীন কাল

www.pathagar.com

থেকেই দয়ালু এবং রুদ্ররূপী একজন আকাশী খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।

এ আকাশী খোদার ধারণা এমনভাবেই বদ্ধমূল হয়ে পড়ে যে, তাঁর সম্পর্কে চিন্তা করতে হলে আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করা ছাড়া আর কোনও উপায় থাকে না। ফলে চীনাদের চিন্তাধারায় আকাশ এক মৌলিক উপকরণ হয়ে দাঁড়ায়।

এ আকাশ-চিন্তা তাদের মন-মগজে এমন করেই বদ্ধমূল হয়ে পড়ে যে, তাদের সংঘ প্রতিষ্ঠান এমনকি চীন রাষ্ট্রটিও 'আকাশী রাষ্ট্র' বলে আখ্যায়িত হতে থাকে।

রোমকরা যখন সর্বপ্রথম এ দেশটির সাথে পরিচিত হয় তখন তারা একটি আকাশী রাষ্ট্রের সাথে পরিচিত হয়েছে বলে মনে করতে থাকে। সেই সময় থেকে Exlum শব্দটির বিভিন্ন রূপই চীনের জন্য ব্যবহৃত হতে থাকে যার অর্থ দাঁড়ায়— 'আকাশবাসী' বা 'আকাশী'। এখনও ইংরেজিতে চীনের জন্য celestial শব্দটি ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যার অর্থ 'আকাশী রাষ্ট্রের বাসিন্দা।'

কালক্রমে চীনারা মৃত স্বজন-পরিজনের আত্মার শক্তিতে বিশ্বাসী হয়ে ওঠে। মৃত স্বজনদের আত্মা পরবর্তী জগতে আকাশী খোদার নৈকট্য লাভের ফলে শক্তিশালী হয়ে ওঠে বলে তারা বিশ্বাস করতে থাকে এবং বিপদাপদ থেকে রক্ষা পাওয়া, অভীষ্ট সিদ্ধি, আকাশী খোদার নৈকট্য লাভ প্রভৃতির জন্য ঐসব শক্তিশালী আত্মার পূজা অপরিহার্য বলে মনে করতে থাকে। বলাবাহুল্য, এমনিভাবেই সেখানে মৃত স্বজন-পরিজনদের পূজা শুরু হয়ে যায়।

গ্রীস : গ্রীকরা তাদের ভাষায় জুপিটারের নাম দিয়েছিল— জিউস (Zeus)। এ জিউস বা জুপিটারের মূর্তিপূজা থেকেই সেখানে মূর্তিপূজার সূচনা হয়। পরে অ্যাপোলো (সূর্যদেব) ডায়েনা (জুপিটারের কন্যা এবং মৃগয়া ও সতীত্বের দেবী), মিনার্ভা (জুপিটারের অন্যতম কন্যা এবং জ্ঞান, যুদ্ধ ও চারু শিল্পের দেবী) প্রভৃতির মূর্তিও সেখানে পূজিত হতে থাকে। তদানিন্তনকালে বিশেষ সভ্য জাতি বলে প্রসিদ্ধি লাভের কারণে গ্রীক-সভ্যতা এবং তাদের মূর্তিপূজার প্রভাব পাশের দেশগুলোতেও ছড়িয়ে পড়েছিল বলে অনেকে মনে করেন। গ্রীক বীর আলেকজান্ডারের ভারতে আগমনের পরে এখানে গ্রীক-সভ্যতার এবং মূর্তিপূজার প্রভাব পড়েছিল বলেও অনেকে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করেন।

মিসর : খ্রিস্টপূর্ব ৩৭০০ অব্দে অর্থাৎ এখন থেকে প্রায় ৫৬৮২ বছর পূর্বে মিসরের প্রথম পিরামিডটি নির্মিত হয়েছিল বলে জানতে পারা যায়। এ পর্যন্ত

www.pathagar.com

মোট ৭০টি পিরামিড আবিষ্কৃত হয়েছে এবং আরো ১৬টির অস্তিত্ব ছিল বলে জানতে পারা গিয়েছে।

গীজ (Gizah)-এর পিরামিডটিই সর্ববৃহৎ। প্রায় ৪০ বিঘা জমির ওপর এক লক্ষ শ্রমিক কুড়ি বছরে এর নির্মাণকার্য সমাধা করে। রাজা কিয়াপস্ (cheops)-এর মমীকৃত শবদেহ এখানে সমাহিত রয়েছে।

পিরামিডগুলো যে তদানিন্তন কালের মিসরীয় রাজাদের সমাধি এবং এগুলোর মধ্যে যে তাদের মমীকৃত শবদেহগুলোকে বহু ধনরত্ন, আসবাবপত্র, খাদ্যদ্রব্য, দাস-দাসী প্রভৃতিসহকারে সমাহিত করা হয়েছে কোনও শিক্ষিত ব্যক্তিরই সেকথা অজানা নয়।

মিসরের রাজা বা ফেরাউনরা যে নিজেদের প্রজাসাধারণের প্রভু প্রতিপালক, হুকুমদাতা, দণ্ডমুণ্ডের কর্তা প্রভৃতি বলে দাবি করতো আর দেশবাসীর যে ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায়ই হোক তাদের এ দাবি মেনে চলতে হতো সেকথাও প্রায় সকলেরই জানা রয়েছে।

হযরত মূসা (আ.) যে একাজের বিরোধিতা করার কারণে তদানিন্তন ফেরাউনের রোষাণলে পড়ে অগত্যা বনী ইসরাইলদের নিয়ে মিসর থেকে পালিয়ে এসে ছিলেন সেকথাও প্রায় সর্বজনবিদিত।

জীবদ্দশায় প্রভু, প্রতিপালক, হুকুমদাতা, দণ্ড-মুণ্ডের কর্তা প্রভৃতি বলে স্বীকৃতি জানানো এবং মৃত্যুর পরে তাদের শবদেহ ঘটা করে মমীতে পরিণতকরণ এবং এহেন ব্যয়-বহুল ও রাজকীয়ভাবে সমাহিতকরণকে যে রাজা বা সম্রাটপূজা ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না সেকথা বলাই বাহুল্য। অতএব এখন থেকে ৫৬৮২ বছর পূর্বে যে মিসরে এ সম্রাটপূজার সূচনা হয়েছিল সেকথা অনায়াসে বুঝতে পারা যাচ্ছে।

বেবিলোনীয় অঞ্চ (ভূমধ্য উপত্যকা— Mediterranean Valley) :

এ পুস্তকের 'মূর্তিপূজার প্রাচীনত্ব' শীর্ষক নিবন্ধে এখন থেকে প্রায় সাড়ে আঠারো হাজার বছর পূর্বে হযরত আদম (আ.) ও হযরত নূহ (আ.)-এর অন্তর্বর্তী সময়ের ওয়াদ, ছুওয়া, ইয়াগুচ্ছ ও নছর নামক পাঁচজন বিশেষভাবে জনপ্রিয়া সাধু-পুরুষের মূর্তিপূজা থেকেই এ পৃথিবীতে মূর্তিপূজা সূচনা হওয়ার তথ্য-প্রমাণাদি তুলে ধরা হয়েছে। অতএব বেবিলোনীয় অঞ্চলের পরিবেশ অনুযায়ী সেখানে যে সাধু পুরষদের পূজা, অন্য কথায় নর-পূজা সূচনা হয়েছিল সেকথা অনায়াসে বুঝতে পারা যাচ্ছে।

তবে মনে রাখা ভালো যে, এটা সাধুপুরুষ পূজার সূচনা মাত্র। কালক্রমে অন্যান্য দেশে কোনও না কোনও পদ্ধতিতে সাধুপূজা শুরু হয়ে যায়। খোদার

www.pathagar.com

পুত্র কল্পনা করে হযরত ওজায়ের (আ.)-এর পূজা, ঈশ্বরের ঔরসজাত একমাত্র পুত্র, অন্যতম ঈশ্বর, ত্রাণকর্তা প্রভৃতি আখ্যাদান করে হযরত ইসা (আ.) বা যিশুখ্রিস্টের পূজা, জগাই-মাধাই (জগদানন্দ গোস্বামী এবং মাধবানন্দ গোস্বামী, শ্রীচৈতন্য, গৌতম বুদ্ধ, মহাবীর জৈন প্রভৃতির পূজা তার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ বহন করছে।

তৌহিদের প্রতি প্রকৃত আস্থাশীল ব্যক্তিবর্গ নিজেদের আশেপাশে একটু নযর দিলেও এমনি ধরনের সাধু-পূজা, স্বজন-পূজা, নরপূজা, নারীপূজা, কবরপূজা প্রভৃতির অসংখ্য বাস্তব নিদর্শন স্বচক্ষে দেখতে পাবেন।

একথা ভেবে নিদারুণ দুঃখ, বেদনা ও হতাশায় বিস্মিত হতে হয় যে, যেসব মহাপুরুষ ও জননেতা বিলাস-ব্যসনকে অতীব ঘৃণাভারে পরিত্যাগ করে কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনার পথ বেছে নিয়েছিলেন, সারা জীবন রোজা ও স্বল্পাহারে দিন কাটিয়ে দুঃস্থ, দুর্গত ও অভুক্ত অর্ধভুক্ত কাঙালদের সেবায় অকাতরে সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়েছিলেন, লঙ্গরখানা খুলে প্রত্যহ হাজার হাজার অভুক্ত অর্ধভুক্তের দুমুঠো অন্নের সংস্থান করেছিলেন, এক শ্রেণীর তথাকথিত ধার্মিক ব্যক্তি আজ কোটি কোটি অভুক্ত-অর্ধভুক্ত মানুষকে বঞ্চিত রেখে সেইসব মহাপুরুষ ও জননেতার কবর লক্ষ লক্ষ টাকা মূল্যের নিত্য নতুন গিলাফ বা চাদরে আবৃত করে ধর্মের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন। আর এক দিকে নিজেদের কার্যকলাপের দ্বারা ওপরোক্ত মহাপুরুষ ও জননেতাদের আদর্শ পদদলিত করে চলেছেন আবার অন্যদিকে প্রত্যহ হাজার হাজার টাকার মোমবাতি, আগরবাতি, চন্দন, আতর প্রভৃতি দিয়ে ওপরোক্ত কবরসমূহের মর্যাদা বৃদ্ধি অপপ্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন।

আমার আশঙ্কা হয় যে, সেই মহাবিচারের দিনে ওপরোক্ত মহাপুরুষ এবং জননেতারা এ অন্যায়, অপচয়, কবরপূজা এবং আদর্শবিরোধী কার্যকলাপের জন্য কঠোর ভাষায় শুধু প্রতিবাদই করবেন না— চরম শাস্তি বিধানের জন্যও আল্লাহর কাছে ফরিয়াদী হবেন।

পরিবেশের প্রভাবেই যে এ ভিন্ন ভিন্ন কয়েকটি দেশের মানুষ শিবলিঙ্গ, কল্পিত দেবদেবীর মূর্তি, অগ্নি, সূর্যাদি, প্রাকৃতিক পদার্থ, মৃত স্বজন-পরিজনদের আত্মা, দেশের রাজা, সাধু পুরুষ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ এবং সত্তা ও শক্তিকে প্রধান উপাস্য হিসেবে গ্রহণ ও তাদের পূজা উপাসনার সূচনা করেছিল তা অনায়াসে বুঝতে পারা যাচ্ছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের অবস্থা যে এ থেকে ভিন্ন নয় উল্লিখিত কয়েকটি দেশের নমুনা থেকেই তা বুঝতে পারা যাবে বলে আশা করি।

www.pathagar.com

উপসংহার

পৃথিবীতে মূর্তিপূজার সূচনা কিভাবে হয়েছিল 'আল বেরুনীর ভারত-তত্ত্ব' নামক গ্রন্থের একাদশ অধ্যায়ের শুরুতে সেকথা সংক্ষেপে অথচ অতি সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য তার কিছু অংশ এখানে হুবহু উদ্ধৃত করা যাচ্ছে :

"একথা সুবিদিত যে সাধারণ লোকের মন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তবতার দিকেই আকৃষ্ট হয় এবং ভাব-জগতের প্রতি তাদের সহজাত বিরাগ থাকে। যে জ্ঞানী ব্যক্তিরা ভাবাত্মক বিষয় হৃদয়ঙ্গম করতে পারে সাধারণ লোকের মন চাক্ষুস দৃষ্টান্তেই তৃপ্ত হয়, যেহেতু ইহুদী, খ্রিস্টান ও বিশেষ করে Manichacan প্রভৃতি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নেতারা তাদের গ্রন্থে ও উপাসনা-গৃহে চিত্র ও প্রতিমূর্তি রচনা করে পথভ্রষ্ট হয়েছেন।"

"একটি উদাহরণ থেকেই আমার এ কথার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাবে। আমাদের নবীর বা মক্কা-মদীনার একটি চিত্র যদি কোনও অশিক্ষিত পুরুষ ও স্ত্রী লোককে দেখান হয়, তুমি দেখবে যে, সে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে চিত্রটিকে চুম্বন করছে, কপোল স্পর্শ করাচ্ছে, তাকে সম্মুখে রেখে ধূলায় গড়াগড়ি দিচ্ছে, যেন সে আসল ব্যক্তি বা পবিত্র গৃহকেই দেখছে এবং সেই ধারণায় সে যেন হজ্জের সমস্ত অনুষ্ঠানই পালন করছে।"

"প্রতিমা নির্মাণ এ কারণেই হয়ে থাকে। এগুলো আসলে নবী, জ্ঞানী, দেবতা প্রমুখ শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে তৈরি হয়, যার দ্বারা তাদের অনুপস্থিতিতে বা মৃত্যুর পরে তাদের গুণের কথা লোকের মনে জাগরুক থাকে, সাধারণের অন্তরে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার ভাব অম্লান থাকে।"

"স্মারকমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হবার বহুকাল, বহু শতাব্দী কেটে গেলে তার আসল উদ্দেশ্য লোকে ভুলে যায় এবং তাকে অর্চনা করে সম্মান করা প্রথা ও অভ্যাসে পরিণত হয়ে পড়ে। পরে সাধারণের এ মনোবৃত্তির সুযোগ নিয়ে শাস্ত্রকারেরা এ অভ্যাসকে বিধানের অন্তর্ভুক্ত করে দেয়। এখন এ মূর্তি ও চিত্রগুলোতে পূজা করা লোকের ধর্মীয় কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়।"

www.pathagar.com

আমার বাস্তব এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে অত্যন্ত দৃঢ়কণ্ঠে এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আমি বলতে পারি যে, মূর্তিপূজকদের মধ্যে জ্ঞান-বিবেকসম্পন্ন এমন বহু ব্যক্তিই রয়েছেন যাঁরা অন্তর দিয়ে মূর্তিপূজাকে সমর্থন করেন না, এমনকি এ কাজকে বর্বর যুগীয় চিন্তাধারা-প্রসূত বলেও তাঁদের অনেককে মন্তব্য করতেও দেখা যায়, শুধু বংশানুক্রমিক প্রথা হিসেবে এবং সমাজের ভয়ে অগত্যা তাঁরা মূর্তিপূজার নামে প্রহসন চালিয়ে যাচ্ছেন।

মূর্তিপূজা যে মূল লক্ষ্য নয়, মনকে একত্ববাদী ধ্যান-ধারণার উপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য প্রশিক্ষণমূলক একটি সাময়িক ব্যবস্থামাত্র এবং মনস্থির হওয়ার সাথে সাথে মূর্তির অপসারণ না করা যে একত্ববাদকে অস্বীকার ও উপেক্ষা করা, সুতরাং অতি জঘন্য পাপজনক শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেরই সেকথা জানা রয়েছে। হাজার হাজার বছরে একটি মনও যে স্থির হয়নি ফলে কুত্রাপি একটি মূর্তিরও অপসারণ ঘটেনি ওপরন্তু মূর্তিপূজাকে যে আসল কাজ বলে চিরস্থায়ীভাবে গ্রহণ করা হয়েছে সে-দৃশ্যও তাদের চোখের সম্মুখেই রয়েছে।

অথচ এর প্রতিকারের কোনও উদ্যোগ তাঁরা গ্রহণ করছেন না। এমনকি এ প্রশিক্ষণমূলক ব্যবস্থাটি যে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে ক্ষণিকের তরেও সেকথা তাঁরা ভেবে দেখছেন না।

অবশ্য এর কারণও রয়েছে। আমরা মনে করি এর অন্যতম প্রধান কারণটি হলো— মূর্তিপূজাকে সত্য সনাতন এবং অভিষ্ট সিদ্ধি ও ইহ-পারলৌকিক কল্যাণ লাভের সুপরিক্ষিত একমাত্র ধর্মীয় অনুষ্ঠান হিসেবে জনমনে যে বিশ্বাস গড়ে তোলা হয়েছে এবং হাজার হাজার বছরে যে বিশ্বাসের শিকড় মস্তিষ্কের প্রতিটি রন্ধ্রে এবং প্রতিটি শিরা-উপশিরায় বদ্ধমূল হয়ে গেড়ে বসার সুযোগ পেয়েছে তা অপসারিত করা কত কঠিন সেকথা তাঁরা জানেন এবং জানেন বলেই তাঁরা এ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে চলেছেন। এতদ্বারা তাঁরা যে তাঁদের নৈতিক এবং সামাজিক দায়িত্বকে ভীষণভাবে উপেক্ষা ও অবহেলা করে চলেছেন অতীব দুঃখের সাথে সেকথা না বলে পারা যাচ্ছে না।

অন্যায়ের প্রতিরোধ এবং ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠায় বাধা-বিঘ্ন এবং বিপদ-আপদ অবশ্যম্ভাবী, সকলেই যদি এ বাধা-বিঘ্ন ও বিপদাপদের ভয়ে দায়িত্ব পালনে বিরত থাকে তবে গোটা জাতিকেই ধ্বংসের কবলে নিপতীত হতে হয়। আর এজন্য তাদেরই দায়ী হতে হয়— যারা সবকিছু জেনে বুঝেও নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছেন।

সংশ্লিষ্ট মহলের কাছে সেগুলো তুলে ধরাকে আমি আমার একটি অপরিহার্য নৈতিক ও সামাজিক দায়িত্ব বলে মনে করি। এ দায়িত্ব পালনের কাজে অন্যদের

www.pathagar.com

মতো নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করা হলে মহাবিচারের দিনে মহান বিশ্বপ্রভুর কাছে আমাকে যে ভীষণভাবে দায়ী হতে হবে সে সম্পর্কে আমার মনে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই।

এ দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়েই সকল প্রকার ভয় ভীতি, বাধা-বিঘ্ন, বিপদ-আপদ, নিন্দা-সমালোচনা প্রভৃতির দিকে দৃষ্টিপাত না করে প্রায় সারাটি জীবন আমার সীমিত সাধ্যশক্তি অনুসারে সেই দায়িত্ব পালনের চেষ্টা আমি করে চলেছি।

আজ জীবনের শেষপ্রান্তে উপনীত এবং বার্ধক্যকবলিত অবস্থায়ও আমি আমার সেই প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছি। 'মূর্তিপূজার গোড়ার কথা'-ই আমার লিখিত একমাত্র পুস্তক নয়। ইতোপূর্বেও এ একই উদ্দেশ্যে অনেকগুলো পুস্তক-পুস্তিকা আমাকে লিখতে হয়েছে।

এসব পুস্তকাদি লিখে নাম, যশ, প্রশংসা, ধন্যবাদ প্রভৃতি কোনও কিছু লাভের সামান্যতম ইচ্ছা এবং আগ্রহও আমার নেই। আজ জীবনের বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে ওসবের কোনও কিছু চিন্তা করার মানসিকতাও আমার নেই। দায়িত্ব পালনের ত্রুটির জন্য সমাজ এবং মহান বিশ্বপ্রভুর কাছে ক্ষমা লাভের একমাত্র বাসনা নিয়েই আমি একাজ করে চলেছি।

পরিশেষে সাধারণভাবে গোটা হিন্দুসমাজ এবং বিশেষভাবে আমার প্রাণপ্রিয় ভট্টাচার্য সম্প্রদায়ের কাছে আমার অন্তরের একটি আকুল আবেদন জানিয়ে প্রসঙ্গের ইতি টানতে চাই।

জানি, আমার এ আবেদন তাঁদের অনেকেই অতীতের মতো উপেক্ষা অবহেলা প্রদর্শন অথবা ভিন্নভাবে গ্রহণ করবেন। তবে যিনি যা-ই ভাবুন এবং যা-ই করুন আমার কর্তব্য আমাকে পালন করে যেতেই হবে।

সেই আবেদনটি হলো— লিঙ্গ বা শিবলিঙ্গ পূজার বিষয়টি বিশেষভাবে ভেবে দেখার আবেদন। অবশ্য এ লিঙ্গপূজার সমর্থনে বহু দার্শনিক যুক্তি আপনাদের রয়েছে এবং বিজ্ঞতা সহকারে সেগুলোকে উপস্থাপিত করতেও আপনারা সক্ষম। কিন্তু যত কিছুই থাক বাহ্যত এটা যে অশ্লীল, বিভৎস এবং আধুনিক সভ্য-শিক্ষিত সমাজের একান্তই অনুপযোগী সেকথা কোনওক্রমেই আপনারা অস্বীকার করতে পারেন না।

সুদূর অতীতের পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যশীল হলেও বর্তমান পরিবেশে লিঙ্গপূজা যে ভীষণভাবে অসমঞ্জস্য এবং রুচিবিগর্হিত কাজ আপনাদের মতো জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি যে সেকথা বোঝেন না এটা কোনওক্রমেই স্বীকার করে নেয়া যায় না।

www.pathagar.com

অতীতের সাথে সুসমঞ্জস ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি অগ্রগতির সাথে তেমন বহু কিছুকেই বর্জন অথবা যুগোপযোগী করে নিয়ে আধুনিক সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে গড়ে তোলা হয়েছে। এমতাবস্থায় শিবলিঙ্গ-পূজার কাজটি আপনাদের পুনর্বিবেচনার দাবি রাখে বলেই আমি মনে করি। আপনাদের অবগতির জন্য বলা প্রয়োজন যে, বহুদিন পূর্বে শিবলিঙ্গপূজা বর্জন করে এসেও আমি স্বস্তি পাচ্ছি না। মাঝে মাঝেই আমাকে এ নিয়ে ভীষণভাবে বিরূপ ও লজ্জাজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এ সম্পর্কে দুটি মাত্র বাস্তব ঘটনা আপনাদের কাছে তুলে ধরছি।

প্রথম ঘটনাটি ঘটে এখন থেকে ১১ বছর পূর্বে। আমার ছেলে শামসুদ্দোহা তার জৈনক বন্ধুকে সাথে নিয়ে কার্যোপলক্ষে কোলকাতা গিয়েছিল। আমার পরামর্শ অনুযায়ী একদিন তারা আমার ভগ্নিপতির বাসায় যায়। তিনি সে সময়ে পূজামণ্ডপে লিঙ্গমূর্তিকে সম্মুখে রেখে চক্ষু মুদ্রিত অবস্থায় ধ্যান করছিলেন।

পূজার পরে তিনি বাইরে আসেন এবং বেশ হৃদ্যতা সহকারে উভয়ের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করেন। আমার ছেলের বন্ধুটি কৌতূহলবশত জানতে চায় যে, তিনি এতক্ষণ যে মূর্তিটির পূজা ও ধ্যান করলেন ওটা কোন্ দেবতার মূর্তি। সেটা যে শিবলিঙ্গের মূর্তি আমার ভগ্নিপতির উত্তরে সেকথা সে জানতে পারে।

কিছুটা সময়ের অভাব আর কিছুটা দ্বিধা-সঙ্কোচের কারণে মূর্তিটির আর কোনও পরিচয় সে জানতে চায় নি। কিন্তু জানার একটা বিশেষ আগ্রহ সে পোষণ করতে থাকে।

ঢাকায় ফিরে এসে একদিন কথা প্রসঙ্গে 'শিবলিঙ্গ' বলতে কোন্ মূর্তিকে বোঝায় এবং কেন তার পূজা করা হয় ছেলেটি সহজ-সরলভাবে আমার কাছে সেকথা জানতে চায়।

পুত্রের বন্ধু হিসেবে ছেলেটি আমার পুত্র সদৃশ। শিবলিঙ্গের উৎপত্তি এবং পূজার উদ্দেশ্য সম্পর্কে পুরাণসমূহে যেসব বিবরণ রয়েছে পুত্র সদৃশ ছেলেটির কাছে তা তুলে ধরা এবং সম্ভাব্য প্রশ্নাদির উত্তর দেয়ার বিষয়টি চিন্তা করতেই লজ্জায় এবং দুঃখে আমি ম্রিয়মান হয়ে পড়ি। বাধ্য হয়ে কৌশলে সেদিন তার প্রশ্নটিকে এড়িয়ে যেতে হয়। পরবর্তী সময়েও নানা কৌশলে এ প্রশ্নের পুনরুল্লেখের সুযোগ তাকে আর আমি দেইনি।

অন্য ঘটনাটি ঘটে নাটোর দিঘাপাতিয়া জমিদারের সুপ্রসিদ্ধ কালীবাড়িতে। তখন আমি সরকারের কৃষিতথ্য কেন্দ্রে চাকুরি করি। আমেরিকার জৈনিক উপদেষ্টাসহ আমরা কতিপয় সরকারি কর্মচারি বিভিন্ন কৃষি প্রকল্প দেখার জন্য

www.pathagar.com

নাটোর গিয়েছি। উপদেষ্টা সাহেবের আগ্রহাতিশয্যে আমরা নাটোর এবং দিঘাপাতিয়া রাজবাড়ি দেখে কালিবাড়িতে যাই।

হঠাৎ পাথরের বৃহদাকৃতি লিঙ্গমূর্তিটির প্রতি সাহেবের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ওটা কিসের মূর্তি পার্শ্ববর্তী ব্যক্তির কাছে সেকথা তিনি জানতে চান। উক্ত ভদ্রলোক সাহেবকে আমার কথা বলেন এবং দলের মধ্যে একমাত্র আমিই যে ও-সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত সেকথাও সাহেবকে জানান।

তখন শুধু সাহেবই নন উপস্থিত সকলে ও-সম্পর্কে কিছু বলার জন্য আমাকে অনুরোধ করতে থাকেন। কিন্তু একজন বিদেশি সাহেবের কাছে এ লিঙ্গমূর্তির ব্যাখ্যা প্রদান করলে বাঙালি জাতি বিশেষ করে হিন্দুসমাজের রুচি, প্রকৃতি, শালীনতা-বোধ প্রভৃতি সম্পর্কে তার মনে কি ধারণার সৃষ্টি হবে এবং হয়তো এ নিয়ে তিনি ঠাট্টা বিদ্রূপও করতে পারেন ইত্যাদি ভেবে আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ি। অবশেষে সকলের পিড়াপিড়িতে বেশ কিছুটা রেখে-ঢেকে একটা মনগড়া উত্তর দিয়ে আমাকে সেদিন রেহাই পেতে হয়। বলাবাহুল্য, জীবনে অনেকবারই এরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন আমাকে হতে হয়েছে। হয়তো মৃত্যুর পূর্বে এ থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব হবে না।

তাই আজ বৃদ্ধ বয়সে হৃদয়ের সকল ব্যাকুলতা নিয়ে হয়তো শেষবারের মতো আপনাদের কাছে এ আবেদন জানাচ্ছি যে, আধুনিক বিশ্বে সাধারণভাবে কোনও কল্পিত দেবদেবীর মূর্তি এবং বিশেষভাবে শিবলিঙ্গের মূর্তি উপাস্য হিসেবে পূজা পেতে পারে কিনা গভীরভাবে সেকথাটা আপনারা ভেবে দেখুন এবং এ কথাটাও ভেবে দেখুন যে এ পূজার দ্বারা বিশ্ববাসীর কাছে আপনারা অজ্ঞ, লজ্জাহীন এবং বিকৃত রুচিসম্পন্ন হিসেবে পরিচিত হচ্ছেন কিনা।

শেষবিচারের দিনে আমাকে মহান আল্লাহর দরবারে বিশেষভাবে দায়ী হতে হবে বলে অতঃপর মুসলমান-সমাজের কাছে হয়তো শেষবারের মতই একটি আকুল আবেদন এবং সঙ্গে সঙ্গে কঠিন সতর্কবাণী রেখে যেতে চাই। আর তা হলো :

ইসলাম এবং একমাত্র ইসলামই বিশ্ববাসীকে নির্ভেজাল তাওহীদের উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছে এবং আদর্শ মানুষ ও আদর্শ তাওহীদবাদী হয়ে গড়ে ওঠার নির্ভুল এবং নির্ভরযোগ্য পথও প্রদর্শন করেছে। আর একমাত্র এপথেই যে যাবতীয় পুতুল, প্রতিমা, মূর্তি, প্রতীক, প্রতিকৃতি, রাজা-বাদশাহ, সাধু, সজ্জন, গুরু-পুরোহিত, নেতা, প্রিয়জন, প্রকৃতি, প্রবৃত্তি, সম্পদ, স্বজন প্রভৃতি এক কথায় তাগুতি শক্তির পূজা এবং আনুগত্য থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব সুস্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সেকথাও ঘোষণা করেছে।

www.pathagar.com

মুসলমান অর্থাৎ ইসলামের ধারক এবং বাহক হিসেবে বিশ্ববাসীকে সার্থক ও সফলভাবে এ পথ প্রদর্শনের দায়িত্ব আপনাদেরই। বিশেষভাবে এ দায়িত্ব পালন না করা হলে বিশ্বপ্রভুর কাছে শুধু ভীষণভাবে দায়ী-ই হতে হবে না কর্তব্যে অবহেলার জন্যে আপনাদের সার্বিক জীবনেও নেমে আসবে চরম দুর্গতি।

ইসলামের সৌন্দর্য বিশেষ করে তার তাওহীদি শিক্ষায় মুগ্ধ হয়েই আমি এবং আরো অগণিত ব্যক্তি সহায়-সম্পদ, স্বজন-পরিজন, বাড়ি-ঘর প্রভৃতি সবকিছু পরিত্যাগ করে যুগে যুগে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং করে চলেছে।

আমরা সুস্পষ্টরূপে দেখতে পাচ্ছি যে, আপনারা আপনাদের ওপরোক্ত সু-মহান দায়িত্বকে শুধু ভীষণভাবে অবহেলাই করে চলেছেন না— আপনাদের অধিকাংশের মধ্যে সেই দায়িত্বের অনুভূতিটুকুও বিদ্যমান নেই।

অতীব দুঃখ এবং হত্যাশার বিষয় : অবস্থা এখানে এসেই থেমে যায়নি। আপনাদের অনেকেই নিজেদের কার্যকলাপের দ্বারা তাওহীদের চরম অবমাননাও করে চলেছে। আপনাদের মধ্যে ক্রমবর্ধমানহারে পীরপূজা, নেতাপূজা, কবরপূজা, দেশপূজা, স্থানপূজা, লগ্নপূজা, দিনপূজা, আত্মপূজা, প্রভৃতির যে সমারোহ ও তাণ্ডবতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে তা ইতোমধ্যেই বিশ্বের নামকরা মূর্তিপূজক সমাজসমূহকে হার মানিয়েছে।

সুস্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা প্রয়োজন যে, আমাদের প্রাণপ্রিয় আত্মীয়-স্বজন এবং বিশ্বের কোটি কোটি অমুসলমান আপনাদের এ কার্যকলাপের জন্য ইসলামের সৌন্দর্য অনুভব করতে পারছে না এবং ইসলাম গ্রহণের তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারছে না।

অতএব আপনাদের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ! দয়া করে আপনারা ফিরে আসুন এবং আপনাদের ওপর বিশ্বব্যাপী ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার যে মহান দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে নিষ্টা এবং একাগ্রতার সাথে সে-দায়িত্ব পালন করুন।

অন্যথায় নিজেদের জীবনে চরম দুর্গতি ছাড়াও বিশ্বের এ কোটি কোটি মানুষের পথ-ভ্রষ্টতার জন্য আপনারা তো দায়ী হবেনই, ওপরন্তু আমরা নওমুসলিমেরাও হয়তো আমাদের প্রাণপ্রিয় স্বজন-পরিজনদের ইসলাম গ্রহণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির জন্যে মহান আল্লাহর দরবারে বুকফাটা আর্তনাদ সহকারে আপনাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করতে বাধ্য হবো।

মহান আল্লাহ তাঁর অর্পিত দায়িত্বসমূহকে অতীব নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার সাথে আমাদের পালন করার তওফিক দান করুন এবং বিশ্বব্যাপী ইসলামের

www.pathagar.com

প্রচার ও প্রতিষ্ঠার কাজে আমাদের তৎপর ও একনিষ্ঠ করে তুলুন তাঁর সুমহান দরবারে আকুলভাবে এ প্রার্থনা জানাই, আ-মীন।

পরিশেষে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি কবিতার অংশবিশেষ সুধী পাঠকবর্গকে উপহার দিয়ে বিদায় গ্রহণ করছি :

মুগ্ধ ওরে স্বপ্নঘোরে
যদি প্রাণের আসন কোণে,
ধূলায় গড়া দেবতারে
লুকিয়ে রাখিস সংগোপনে।
চিরদিনের প্রভু তবে
তোদের প্রাণে বিফল হবে
বাহিরে সে দাঁড়িয়ে রবে
কত না যুগ যুগান্তরে ॥

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ISBN 984-8747-81-8
9 789848 747810